মাসুদ রানা
দুরন্ত ঈগল ২
কাজী আনোয়ার হোসেন

এক

মালয়েশিয়া। মালয় পেনিনসুলা পুব উপকূল, কোটা বাহারু। জায়গাটা থাই সীমান্ত থেকে বেশি দূরে নয়।

হোটেল শেরাটন ইন্টারন্যাশনাল। দুপুর দুটো। তিনতলা, সিঁড়ি সংলগ্ন একশো এক নম্বর স্যুইট।

রানা এজেন্সির ব্যাংকক শাখার প্রধান লাবণী সামাদের স্যুইট এটা। কদিন আগে পর্যন্ত ওই শাখার প্রধান ছিল ইমরুল কায়েস। থাইল্যান্ডের হাট খোয়াই-এ থাই টং তাকে খুন করবার পর ওই পদের দায়িত্ব লাবণীকে দিয়েছে মাসুদ রানা।

কিন্তু এই মুহূর্তে নিঃসাড় লাবণীর দিকেই তাকিয়ে রয়েছে রানা। তীব্র ব্যথায় টনটন করছে ওর বুকের ভিতরটা।

কাত হয়ে চেয়ারের হাতলে আটকে আছে লাবণীর শরীর, পিঠ থেকে বেরিয়ে আছে বড় একটা ছোরার অলঙ্কৃত হাতলটা।

রানা শুধু লাবণীর গলায় হাত দিয়ে পালস দেখবার জন্য থামল। তার সাদা ব্লাউজ তাজা লাল রক্তে ভিজে গেছে। রক্তের স্রোত পরনের সিল্ক শাড়িটাকেও ভিজিয়ে দিচ্ছে। যতই অবিশ্বাস্য ও নির্মম মনে হোক, লাবণী বেঁচে নেই; তবে প্রাণের স্মৃতি নিয়ে এখনও গরম হয়ে রয়েছে তার শরীরটা।

এজেন্সির প্রধান হিসাবে তার প্রতি রানার একটা দায়িত্ব তো আছেই, তাছাড়াও এই অ্যাসাইনমেন্টে এসে মেয়েটির সঙ্গে ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা জন্মে যাওয়ায় মনটা আবেগপ্রবণ হয়ে উঠতে চাইছে।

নিজেকে শক্ত করল রানা, চেহারায় তার ছাপ পড়ায় নিষ্ঠুর

দেখাচ্ছে মুখটা। কে আর ওর চেয়ে ভাল জানে যে কঠিন এই পেশা শোকাভিভূত হওয়ারও সময় দেয় না।

দ্রুত কামরা থেকে বেরুবার সময় সেল ফোনের বোতাম টিপে সামান্য দায়িত্বটুকুই শুধু সারতে পারল রানা। রিসেপশন হয়ে হোটেলের সিকিউরিটি সেন্টারে খবর চলে গেল, তারা পুলিশ ডাকবে। তারপর ওর এজেন্সির কুয়ালালামপুর শাখায় ফোন করে জানিয়ে দিল কী হয়েছে, কী করতে হবে– লাশটা কফিনে পুরে প্লেনে করে পাঠিয়ে দিতে হবে ঢাকায়।

একটু আগে একটা দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ পেয়েছে, দ্রুত সেটার দিকে এগোল রানা। হোটেলের করিডরে বেরিয়ে এল। ডানদিকে কেউ নেই, শেষ মাথায় এলিভেটর। বাম দিকেও কেউ নেই, শেষ মাথায় দরজা। সেটা ভিতর দিক থেকে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

ছুটল রানা। লম্বা করিডর পার হয়ে দরজার কাছে পৌঁছাল। ওটার মাথায় লেখা রয়েছে, 'সার্ভিস স্টেয়ার'। কবাটে ধাক্কা দিতেই খুলে গেল সেটা, সিঁড়ি বেয়ে নামবার সময় ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখল দরজাটা সিঁড়ির দিক থেকে বন্ধ করবার কোনও ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

প্রতিবার তিনটে করে ধাপ টপকে নীচে নামল ও। আঙিনা পেরিয়ে সরু একটা গলিতে বেরিয়ে এল। গলির একটা দিক ধনুকের মত বেঁকে চোখের আড়ালে হারিয়ে গেছে, আরেকদিক মিশেছে ব্যস্ত মেইন রোডের সঙ্গে।

প্রায় অন্ধকার গলি থেকে মেইন রোডের কড়া রোদের দিকে চেয়ে চোখটা ধাঁধিয়ে গেছে রানার। পলকের জন্য দেখতে পেল, গলি থেকে মেইন রোডে বেরিয়ে যাচ্ছে হালকা নীলরঙা স্কার্টের একটা প্রান্ত। মেয়েটি ব্লাউজ পরেছে, নাকি শার্ট, ভাল করে দেখবার সুযোগ হলো না। রঙটা সম্পর্কেও নিশ্চিত নয় ও, একবার মনে হলো সাদা, আবার মনে হলো নাকি হলুদ?

মেইন রোডে যেমন ট্রাফিকের জ্যাম, ফুটপাথে তেমনি মানুষের ঠেলাঠেলি। ভিড়ের ভিতর দিয়ে পথ করে নিয়ে এগোচ্ছে রানা, চোখ রেখেছে মেয়েটার দিকে।

আকাশী রঙের স্কার্ট আর টি-শার্ট পরে আছে মেয়েটা। দ্রুত রাস্তা পার হলো সে, তবে মনে হলো না রানার কাছ থেকে পালাচ্ছে। তারপর একটা বাঁক নিল। বাঁক নেওয়ার সময় গলাটা একটু লম্বা করল, যেন সামনের কাউকে দৃষ্টিপথে ধরে রাখবার চেষ্টায়।

রানা আন্দাজ করল, মেয়েটিও কাউকে ফলো করছে।

রাস্তা পেরিয়ে বাঁক ঘোরার পর বোঝা গেল, ওর ধারণা মিথ্যে নয়। বেশ কিছুটা সামনে আরেকটা মেয়েকে দেখতে পেল রানা, যাকে ওর সামনের মেয়েটি অনুসরণ করছে। এ-ও নীলচে স্কার্ট আর টি শার্ট পরেছে। দলবেঁধে বেড়াতে বেরুনো পরিবারগুলোর ভিতর মিশে গেছে সে, আচরণে শান্ত স্বাভাবিক একটা ভাব ধরে রাখবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

এখনও বেশ খানিক দূরে, এবং ওর দিকে পিছন ফিরে থাকা সত্ত্বেও, এই দ্বিতীয় মেয়েটাকে চিনতে পারল রানা।

দোই ইনথাননে উত্তরা উৎকর্ণার রেশমকালো চুল ছিল মাথার পিছনে মস্ত একটা খোঁপায় আটকানো, এখন একজোড়া মোটা বেণী হয়ে কোমর পর্যন্ত নেমে এসেছে। তার হাঁটার মধ্যে দৃঢ়তা আছে, আছে নিশ্চিত একটা ভাব ও ছন্দ– রানার সন্দেহ হলো, এ-সবই নার্ভাসনেস লুকানোর চেষ্টা। একটু খুঁটিয়ে লক্ষ করতেই বুঝতে পারল, যে-কোনও কারণেই হোক তটস্থ হয়ে আছে সে। লোকজন ঘাড় ফিরিয়ে তাকাচ্ছে তার দিকে। তারা দেখছে– গর্বিত ভঙ্গিতে হেঁটে চলেছে যেন কোনও রাজকন্যা!

রানার মনে পড়ল, কোনও এক রাজারই মেয়ে বটে উত্তরা!

হাঁটার গতি কমিয়ে এনে প্রথম মেয়েটার পিছনে থাকছে রানা, তবে উত্তরার উপরও চোখ রাখছে।

দুজনের মধ্যে লাবণীকে কে খুন করেছে রানা জানে না। তবে উত্তরার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও অপরাধ বোধ আছে, তা না হলে পিছনের মেয়েটিকে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করছে কেন?

থাই কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট উত্তরা। নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না, তবে লক্ষণ দেখে রানার মনে হচ্ছে সে-ই খুন করেছে লাবণীকে। শত্রুর সংখ্যা কি বাড়ল তা হলে? থাই কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স নীরব, অসহায় দর্শকের ভূমিকা ত্যাগ করে অশুভ কোনও শক্তিকে সাহায্য করছে?

আরেকটা বাঁক নিয়ে কোটা বাহারু সৈকতের দিকে ঘুরে যাওয়ার পর উত্তরার কাঁধ দুটো যেন উত্তেজনায় আড়ষ্ট হয়ে উঠল। মাথাটা একদিকে একটু কাত হলো, কী যেন শোনার চেষ্টা করছে। কাঁধের উপর দিয়ে পিছন দিকে একবারও তাকাল না, তবে ওর চঞ্চল ভাবই বলে দিচ্ছে ও জানে, পিছু নেওয়া হয়েছে।

প্রথম মেয়েটির পিছু নিয়ে স্বাভাবিক ভাবে রাস্তা পার হলো রানা, দুজনের মাঝখানের দূরত্ব একটু কমিয়ে আনল।

হাঁটার গতি আবার বাড়িয়ে দিল উত্তরা। ঢালু রাস্তা ধরে ফিশ মার্কেটের দিকে যাচ্ছে ও। শুধু মাছের বাজার নয়, পাথর দিয়ে বাঁধানো সাগরতীরে প্রচুর দোকান-পাটও আছে।

যে মেয়েটি ওর পিছু নিয়েছে তার বয়স হবে পঁচিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে। পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চির মত লম্বা, স্বাস্থ্য ভাল। পা দুটো অত্যন্ত শক্তিশালী, হাঁটছে অনায়াস একটা ভঙ্গিতে।

একজন পেইন্টার আর তার ক্যানভাসকে ঘিরে ভিড় করেছে একদল ট্যুরিস্ট, সেই ভিড়ের ভিতর ঢুকে পড়ল উত্তরা। তার কাছাকাছি থাকার জন্য পিছু নেওয়া মেয়েটাও কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে লোকজনকে সরিয়ে এগোবার চেষ্টা করছে।

ভিড় থেকে বেরিয়ে কাছাকাছি একটা নটিকল স্টোর দেখতে পেয়ে ঝট্ করে ভিতরে ঢুকে পড়ল উত্তরা।

পিছিয়ে পড়ল রানা, তারপর একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

অপর মেয়েটা ভিড়ের ভিতর দাঁড়িয়ে পড়েছে। তরুণ পেইন্টার নিজের ছবির প্রসঙ্গে দর্শকদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে। তার দিকে মুখ করে থাকলেও, নটিকল স্টোরের দরজার দিকে তাকিয়ে উত্তরার বেরিয়ে আসবার অপেক্ষায় রয়েছে সে।

নটিকল স্টোর থেকে বেরুবার আরেকটা দরজা থাকতে পারে ভেবে লোকজনের ভিড় এড়িয়ে ওটার পিছনদিকে চলে এল রানা।

সাগরের উপর ঝুলে থাকা পাহাড়ের কারনিস থেকে বিকিনি পরা মেয়েরা লাফ দিয়ে পড়ছে পানিতে, প্রায় সবাই শ্বেতাঙ্গ। কাছাকাছি সৈকতে শুয়ে-বসে রোদও পোহাচ্ছে অনেকে।

নটিকল স্টোরের পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল উত্তরা। রাস্তা পার হয়ে হনহন করে হাঁটছে সে, পিছু নেয়া মেয়েটার কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে যেতে চায়।

আবার তার পিছু নিল রানা।

সামনে অ্যান্টিকস, জুয়েলারি, পটারি আর উডকার্ভিং-এর সারি সারি দোকান। ডিসপ্লে শো-কেসে কত কী সাজানো। উত্তরার উপর একটা চোখ রেখে ওগুলো দেখতে দেখতে এগোচ্ছে রানা। মেয়েটির পদক্ষেপে এখনও দৃঢ়তার ছাপ স্পষ্ট, তবে কাঁধ দুটো আড়ষ্ট হয়ে আছে–পিছন ফিরে না তাকালেও ও জানে তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে।

ভাব দেখে রানার মনে হলো, গন্তব্যের কাছাকাছি চলে এসেছে উত্তরা।

অবশেষে একটা বুকস্টোরে ঢুকল ও। দোকানের দোরগোড়া পেরুবার সময় একটা ডোরবেল বেজে উঠল। কাঁচ ঘেরা শেলফে মহাথির মোহাম্মদের উপর লেখা কয়েকটা বই সাজানো।

দোকানের পাশ ঘেঁষে শান্তভাবে হেঁটে যাচ্ছে রানা। জানালা

দিয়ে দেখল কাউন্টারের পিছনে দাঁড়ানো দোকানদারের সঙ্গে কথা বলছে উত্তরা। কাছাকাছি নিউজ স্ট্যান্ড থেকে দৈনিক পত্রিকা ডেইলি সান কিনল ও, মুখের সামনে ওটা মেলে ধরে আবার বুকস্টোরের সামনে দিয়ে হেঁটে গেল।

জানালার ভিতরে কোথাও উত্তরাকে দেখা যাচ্ছে না। দোকানটা বেশ বড়, হয়তো সরে অন্য কোনও দিকে চলে গেছে।

হনহন করে হেঁটে বুকস্টোরের পিছন দিকে, সরু একটা গলির ভিতর চলে এল রানা। এদিকের দরজা বন্ধ দেখল ও। এটা যেহেতু কানাগলি, দু'পাশে বাড়ির দেয়াল, বেরুলে ওকে পাশ না কাটিয়ে উপায় ছিল না উত্তরার।

আবার বুকস্টোরের সামনে ফিরে এল রানা। সানগ্লাস খুলে একজোড়া রিমলেস চশমা পরল, কাঁধ দুটো একটু নিচু ও ঢালু করল, তারপর দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

'ইয়েস, সার? বলুন, কী বই খুঁজছেন।' বুকস্টোরের মালিক ছোটখাট একজন লোক, বেশ বয়স হয়েছে, চোখের দৃষ্টি যেন বহুদূরে নিবদ্ধ। লোকটা থাই কি না নিশ্চিত হতে পারছে না রানা। মালয়েশিয়া আর থাইল্যান্ডের লোকের চেহারা অনেকটাই মেলে।

'মালয়েশিয়ার ইতিহাস সম্পর্কে একটা বই দরকার আমার,' বলল রানা, বড়সড় দোকানটার চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে। 'লেখাটা ভাল হওয়া চাই, শুধু গাদা গাদা তথ্য থাকলেই চলবে না। আর, আধুনিক যুগও যেন কাভার করে।'

'ভেরি গুড, সার। আমার কাছে আছে সেরকম বই।'

লোকটার পিছু নিয়ে শেলফের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা, সাজিয়ে রাখা বইগুলোর শিরদাঁড়ায় চোখ বুলাচ্ছে। 'একটু আগে সুন্দরী এক ভদ্রমহিলা ঢুকেছেন আপনার দোকানে,' বলল রানা, তারপর জানতে চাইল, 'কোথায় গেলেন, তাঁকে দেখছি না যে?'

মাথার এলোমেলো চুল হাত দিয়ে ঠিকঠাক করছে।

‘জী? কিছু বললেন?’

‘আমার ধারণা তিনিও মালয়েশিয়ান হবেন। হয়তো তার কাছ থেকেও দেশটা সম্পর্কে অনেক কিছু জানার আছে আমার।’

চোখে-মুখে সবিনয় একটা ভাব ধরে রেখে রানার কথা না শোনার ভান করছে দোকানদার, শেলফ থেকে একটা বই টেনে নিয়ে বাড়িয়ে ধরল ওর দিকে। ‘এই নিন, মালয়েশিয়ার ইতিহাসের ওপর লেখা এই বইটাই সবচেয়ে নামকরা,’ বলল সে।

‘হ্যাঁ, ঠিক আছে,’ বলল রানা। ‘প্যাকেটে ভরে মেমো করুন। আমি শুধু এক মিনিটের জন্যে আপনার রেস্টরুমটা ব্যবহার করতে চাই, হাত-মুখ ধোব।’

‘সার!’

ফাঁক গলে কাউন্টারের পিছনে চলে গেল রানা, তারপর সরু ও অন্ধকার প্যাসেজে বেরিয়ে দ্রুত এগোল। ওর পিছু নিয়েছে দোকানদার, প্রতিবাদের সুরে বলছে, ‘আরে, কী আশ্চর্য, এ আপনি কী করছেন!’

একটা দরজা খুলল রানা। ভিতরে শুধু বই আর বই, কারও লুকাবার জায়গা নেই।

‘প্লিজ, সার! আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি...’

দ্বিতীয় দরজাটা বাথরুমের। এটা খালি। তারপর দোকানের সামনের দরজা খুলল কেউ, ভেসে আসা ঘণ্টির আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পেল রানা।

দোকানদারকে ধাক্কা দিয়ে পাশ কাটাল রানা, দ্রুত ফিরে এল দোকানে। দুই হাতে প্যাকেট নিয়ে বুকশেলফের দিকে এগোচ্ছে এক মোটাসোটা মহিলা।

লোকটাকে আবার ধাক্কা দিয়ে প্যাসেজের শেষ মাথায় চলে এল রানা। পিছনের দরজার ছিটকিনি খুলে একটা সরু গলির

দু'পাশে তাকাল। কেউ কোথাও নেই। তারপর হঠাৎ করেই বুঝতে পারল কী ঘটেছে।

দরজা খুলে মোটাসোটা মহিলা যখন ভিতরে ঢুকল, তখনই বেরিয়ে গেছে উত্তরা। দোকানের ভিতরেই কোথাও লুকিয়ে ছিল আড়ালে।

এখন আর ওকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়, এতক্ষণে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেছে।

নিজের ব্যর্থতায় হতাশ বোধ করল রানা। লাবণীর সম্ভাব্য খুনিকে পালিয়ে যেতে দিয়েছে সে।

হাত দিয়ে কাপড়চোপড় ঝেড়ে চশমাটা ঠিকমত চোখে আটকাল রানা। 'কত যেন দাম বললেন বইটার?' জিজ্ঞেস করল দোকানদারকে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল লোকটা, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে ঘাম মুছল কপালের, তারপর দাম বলল।

কাউন্টারে একশো রিংগিত-এর তিনটে নোট রেখে বইটা নিল রানা, দোকানদারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, 'রাজকন্যা যদি ফিরে আসেন, তাঁকে বলবেন শহরে মাসুদ রানাকে দেখা গেছে। তাজমহলে পাওয়া যাবে তাকে।'

সূর্য পাটে বসেছে, বুকস্টোর থেকে শেষ বিকেলের নিস্তেজ রোদে বেরিয়ে এল রানা। চোখ থেকে রিমলেস চশমাটা খুলে পকেটে রাখল ও, বাদামী কাগজে মোড়া বইটা বগলদাবা করে হোটেল তাজমহলের দিকে ফিরছে।

ইতোমধ্যে বিদেশি পর্যটকদের ভিড় কমে গেছে, আবার সন্ধের দিকে বাড়বে, মোমের আলোয় ওয়াইন সহযোগে ডিনার খেতে বেরুবে ঝাঁকে ঝাঁকে।

কিন্তু তাজমহল ইন্টারন্যাশনালের সামনে ছোটখাট একটা ভিড় দেখতে পেল রানা। ফুটপাথ ঘেঁষে পুরানো একটা অ্যামবুলেন্স পার্ক করা রয়েছে, ওটার পিছনের দরজা হাঁ-হাঁ

করছে।

সাদা কোট ও মাস্ক পরা অ্যাটেনড্যান্টরা একটা স্ট্রেচার বয়ে নিয়ে এল। ওটার উপর শোয়ানো মানুষটার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চাদরে ঢাকা, শুধু এক পাটি জুতোর অংশবিশেষ বেরিয়ে আছে চাদরের বাইরে। রানা বিশেষভাবে লক্ষ করল, বেশ ছোটখাট একটা শরীর।

ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজন ফিসফাস করছে, বেশিরভাগই হোটেলের স্টাফ আর গেস্ট। সবাই তারা বিষণ্ন ও উদ্বিগ্ন।

একজন স্থানীয় লোককে রানা বলতে শুনল, 'হার্ট অ্যাটাক।'

তার সঙ্গী লোকটা মাথা নেড়ে বলল, 'তুমি কচু জানো! খুব বেশি মদ আর সেক্স! এ-সব করতেই তো এখানে আসে ওরা।' লাশের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল দুজনেই।

সাইরেন বাজিয়ে চলে গেল অ্যামবুলেন্স।

লবিতে ঢুকে রিসেপশনে চলে এল রানা, জানতে চাইল, 'স্ট্রেচারে তুলে কাকে ওরা নিয়ে গেল বলুন তো?'

'কী?' তরুণ ভারতীয় ক্লার্ক ঘামছে। হোটেলে কেউ মারা গেলে ব্যবসায় ধস নামে।

'ভদ্রলোকের নাম মানস ঘোষ নয় তো?' জানতে চাইল রানা, পায়ের এক পাটি জুতো একটু চেনা চেনা লেগেছে ওর।

কেমন যেন ঘাবড়ে গিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল তরুণ। তারপর একটা ঢোক গিলে বলল, 'অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি– ইয়েস, সার, ওই ভদ্রলোকই। বিরাট একটা ট্র্যাজেডি।'

তারপর অন্যদিকে ফিরে ফিসফিস করল সে, রানা যাতে শুনতে না পায়, 'মরার আর জায়গা পেল না, এত থাকতে আমাদের হোটেলে!'

দুই

অদৃশ্য কারও উপর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে। কাউন্টারে জোরে একটা কিল মারল রানা। লাফ দিয়ে উঠল তরুণ ক্লার্ক, রানার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাল।

'কী দুর্ভাগ্য দেখুন না, সার, তাঁকে চেনে এমন কাউকে আমরা পেলাম না,' বলল সে। 'ব্যাপারটা স্রেফ অ্যাক্সিডেন্ট। আমি আপনাকে হানড্রেড পারসেন্ট নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি: এখানে নিরাপত্তা বা শান্তি-শৃঙ্খলায় কোনও রকম বিঘ্ন ঘটবে না...'

ঘুরল রানা, লবি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

'সার, বিলিভ মি! আমাদের গেস্টরা...'

আবার ঘুরল রানা। অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে ওর, মানস ঘোষ মারা যেতে পারে না। 'ভদ্রলোককে কোথায় নিয়ে গেল জানেন?' ঠাণ্ডা সুরে জিজ্ঞেস করল ও।

'মিস্টার ঘোষকে? হাসপাতালে... মর্গে... ঠিক জানি না, সার। তাতে কি কিছু আসে যায়?'

কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছে রানা, গুণ্ডাদের হাত থেকে প্রাণ বাঁচানোর পর ওর সেই অবাক চোখে তাকিয়ে থাকা। 'হ্যাঁ,' বলল ও। 'আমার আসে যায়।'

রানার দিকে বোকার মত তাকিয়ে থাকল ক্লার্ক। 'ঠিক আছে, সার,' অবশেষে বলল সে, রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। 'কতটুকু কী জানা যায় দেখছি আমি।' ক্রেডল থেকে টেলিফোনের রিসিভার তুলল সে।

অলস পায়ে লবির দরজার দিকে এগোল রানা, অন্যমনস্ক, তবে জানে কোনও তথ্য পেলে ওকে ডাকবে ক্লার্ক।

কাঁচ লাগানো দরজার সামনে এসে দাঁড়াল রানা। সঙ্গে সঙ্গে চোখের কোণে একটা নড়াচড়া ধরা পড়ল। মুখ তুলে কার পার্কিং এরিয়ার দিকে তাকাল ও। দেখল ওদিক থেকে কে যেন হাত নাড়ছে। ওর দিকে তাকিয়ে না?

দিনের আলো এখনও সবটুকু মুছে যায়নি, তাই কিশোর ছেলেটিকে চিনতে পারল ও। ওদের গাইড হতে চেয়েছিল সে। রানা দশ রিংগিত দিলেও, বকশিশ নিতে রাজি হয়নি। অগত্যা তাকে একটা কাজ দিয়েছিল ও। বিজ্ঞানী ডক্টর নাদিরার চেহারা ও সম্ভাব্য পরিচ্ছদের বর্ণনা দিয়ে বলেছিল, তিনি একদল থাই লোকের সঙ্গে থাকতে পারেন।

নিচু পাঁচিলের ওপারে, অর্থাৎ রাস্তায় দাঁড়িয়ে রানার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে ছেলেটা। একটা হাত তুলে তাকে হোটেলের মেইন গেটটা দেখিয়ে দিল রানা. তারপর নিজেও ধাপ ক'টা টপকে গাড়ি-পথ ধরে এগোল সেদিকে।

গেট দিয়ে ফুটপাথে বেরিয়ে এল রানা।

ছেলেটাও গেটের কাছে পৌঁছে গেছে। দ্রুত হেঁটে আসায়, কিংবা উত্তেজনায়, সামান্য হাঁপাচ্ছে। 'ওদেরকে পেয়েছি আমি, সার!' বলল সে।

ভ্রূ কোঁচকাল রানা।

'বাঙালি ভদ্রমহিলা, আপনি যাঁর কথা বলেছিলেন,' বলল ছেলেটা। এক পা পিছাল, রানাকে উৎসাহিত হতে না দেখে অনিশ্চয়তায় ভুগছে। 'থাইরা... ভাবলাম আপনি...'

কী যেন ভাবল রানা, তারপর শ্রাগ করে ছেলেটার কাঁধে একটা হাত রাখল। 'কোথায় তারা?'

'আমার সঙ্গে আসুন, দেখিয়ে দিচ্ছি,' বলে ফুটপাথ ধরে হাঁটা ধরল ছেলেটা।

‘তোমার নামটা যেন কী?’ তার পিছু নিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

‘আমি যোধন।’

মনে মনে বিস্মিত হলেও কিছু বলল না রানা। যোধন মানে যোদ্ধা, শব্দটা বাংলা অভিধানেও আছে।

রাস্তায় রাস্তায় বৈদ্যুতিক লণ্ঠন জ্বলে উঠল। দ্রুত পায়ে কাফে ও আন্টিকস-এর দোকানগুলোকে পাশ কাটাচ্ছে ওরা। হাইওয়ে ফাইভ ধরে এগোচ্ছে, তিলক দাঙ্গুন সি বিচকে পাশ কাটিয়ে এল। ডিনারের আগে বেশ কিছু দম্পতি হাঁটতে বেরিয়েছে।

‘আমাদের শহর আপনার পছন্দ হয়েছে, সার?’ জানতে চাইল কিশোর গাইড। ‘সুন্দর সি বিচ, পাহাড়, লেক, জঙ্গল, হোটেল ফ্যাসিলিটি, সিকিউরিটি–সব মিলিয়ে দারুণ না?’

‘সত্যি দারুণ,’ বলল রানা। ‘তবে বেশ বড় শহর। এতই বড়, তোমার একার পক্ষে নির্দিষ্ট কোনও লোককে খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন।’

‘হ্যাঁ, প্রচুর ট্যুরিস্ট,’ সায় দিয়ে বলল যোধন। ‘তবে আমার এক আংকেল পোস্টম্যান, এক আন্টি কাজ করে বিউটি শপে। আর কাজিনরা সবাই রাস্তা পরিষ্কার করে।’ গর্বের সঙ্গে হাসল সে। ‘কোটা বাহারু আমাদের শহর।’

‘আচ্ছা,’ বলে ম্লান একটু হাসল রানা। ‘দুনিয়ায় তোমার তা হলে কেউ নেই।’

অবাক হলো যোধন। ‘কী করে বুঝলেন?’

‘সবার কথাই বলছ, শুধু মা-বাবার কথা বাদে,’ বলল রানা। ‘তা ছাড়া, এত কম বয়সে তোমাকে কাজ করতে হয়।’

‘কাজ না করলে লেখাপড়ার খরচ যোগাবে কে? আমার মা-বাবা নেই,’ বলল ছেলেটা। ‘ফিশিং অ্যাক্সিডেন্ট, সার।’

‘দুঃখিত,’ বলল রানা।

কাঁধ ঝাঁকাল যোধন। 'জীবন যখন যেমন, সার।'

বারো বছরের একটা ছেলের মুখ থেকে ঠিক এরকম একটা দার্শনিক কথা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিল না রানা।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে যোধন বলল, 'আমি আমার খালার সঙ্গে থাকি, সার।'

'যিনি বিউটি শপে কাজ করেন।'

'দুজন আমরা ভালই আছি,' হেসে উঠে বলল ছেলেটা। 'খালা তার চুল আগুনের মত লাল করে রাখে। উৎসবের সময় আমার গালে ড্রাগন এঁকে দেয়।'

'দুজন তোমরা খুব মজা করো।'

'তবে লেখাপড়া শিখে চায়নায় যেতে চাই আমি, অনেক বড় বিজ্ঞানী হতে চাই। আপনার কোনও ধারণা আছে, চায়না কেমন দেশ?'

'বিশাল দেশ, মহান একটা জাতি,' বলল রানা। 'এক সময় বিদ্যা-বুদ্ধি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে ওরাই তো সবার চেয়ে এগিয়ে ছিল। ওদের ভবিষ্যৎও খুব উজ্জ্বল।'

হাইওয়ে ছেড়ে ক্রমশ উঁচু একটা সরু পথ বেয়ে উঠছে ওরা। সামনে ছোট পাহাড়, অন্ধকারে অশুভ ও বিপজ্জনক লাগছে।

'ড্রাইভওয়েটা ওপাশে,' হাত তুলে ডানদিকটা দেখাল যোধন। 'এটা শর্টকাট পথ।'

'আশপাশে আর কোনও বাড়ি-ঘর আছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আর মাত্র দু'চারটে, তবে কাছেপিঠে একটাও নয়। লোকজন এদিকটায় ছুটি কাটাতে আসে। মালিকরা তো আর থাকে না, তাই বেশিরভাগ সময় খালিই পড়ে থাকে।'

'আচ্ছা,' বলল রানা। 'আমি আমার বন্ধুকে সারপ্রাইজ দিতে চাই। এই নাও।' ছেলেটার হাতে কয়েকটা নোট গুঁজে দিল ও।

'টাকা-পয়সা জমাতে শুরু করো, চিনে তুমি ঠিকই যেতে পারবে।'

'সত্যি?' প্রত্যাশায় চকচক করছে ছেলেটার চোখ দুটো।

'সত্যি।' ওর মাথার চুল একটু এলোমেলো করে দিল রানা। 'আমি জানি তোমার যুদ্ধে তুমি জিতবে, মাই সান।'

নোটগুলো উঁচু করে চাঁদের আলোয় ধরল যোধন। 'এত টাকা!' আনন্দে হেসে উঠল সে। 'আপনার অনেক বড় কাজ করে দিয়েছি?'

'অ-নে-ক ব-ড়,' বলল রানা। 'এবার শহরে ফিরে গিয়ে পুলিশকে খবর দাও। আমার কথা বলবে–বাংলাদেশী একজন এজেন্ট। আর বলবে–থাই থান্ডার। কী বলবে?'

'বাংলাদেশী একজন এজেন্ট আর থাই থান্ডার!' চোখ দুটো গোল গোল হয়ে উঠল যোধনের, অর্থাৎ সে-ও জানে থাই থান্ডার মাফিয়াদের একটা সংগঠন।

'গুড। বলবে এদিকে থাই থান্ডারের একটা আস্তানা আছে। ভাল করে বুঝিয়ে দেবে কোথায়। ওরা এসে আমাকে পেতেও পারে, তবে সম্ভাবনা কম। এত কথা মনে রাখতে পারবে তুমি?'

'ইয়েস, সার!' হঠাৎ করে উত্তেজিত হয়ে ওঠায় যোধনের মুখের ভিতরটা শুকিয়ে গেছে।

'তা হলে দৌড় দাও!' তার পিঠ মৃদু চাপড় দিল রানা।

ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে যোধন, ঝোপ ও গাছপালার ভিতর দিয়ে ছুটছে, একসময় বাঁক নিয়ে হারিয়ে গেল।

ঘুরল রানা, সরু পথ ধরে আবার উঠছে। একটু পরেই গাছপালার ফাঁক দিয়ে সামনে একটা বাড়ির ম্লান আলো দেখতে পেল ও।

হাঁটার গতি কমাল, নিশাচর পাখি ও ঝিঁঝি পোকার ডাক শুনছে। বাড়ির বাইরে নিশ্চয়ই কোথাও পাহারা বসানো হয়েছে। সিঙ্গাপুরে বেশ কিছু লোককে হারানোর পর থাই থান্ডারের

লোকবল কম হতে পারে, তাই বলে নিজেদেরকে অরক্ষিত রাখবে না ওরা।

সামনের পথ থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এল, যেন সরু ডাল ভাঙল। তারপর বারুদ ও তামাকের ক্ষীণ গন্ধ ঢুকল নাকে, দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরিয়েছে কেউ।

সাবধানে এগোচ্ছে রানা, নরম পায়ে হাঁটছে। ডালগুলোর পাতা ঘষা খাচ্ছে ওর কাপড়ে।

সেন্ট্রি লোকটা দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা পাইন গাছের তলায়। চওড়া শাখাগুলোর নীচে সে-ও যেন ছোট একটা গাছ। বুকের কাছে আড়াআড়ি ভঙ্গিতে ধরে আছে একটা একে-ফোরটিসেভেন। মুখে সিগারেট।

ট্রেইল থেকে সরে এল রানা। প্রতিবার এক পা করে নিঃশব্দে এগোচ্ছে। হঠাৎ কাছাকাছি কোথাও থেকে একটা পেঁচা ডেকে উঠল। ভয় পেয়ে দু'তিনটে নিশাচর পাখি ডানা ঝাপটে উড়ে গেল।

ঘুরল সেন্ট্রি, রানার দিকে পিছন ফিরল। আরেকটা পেঁচা ডাকল, বোধহয় সাড়া দিচ্ছে।

সাবধানে এগিয়ে চলেছে রানা।

ছ'ফুট দূরে সেন্ট্রি তার সিগারেট মাটিতে ফেলে জুতো দিয়ে মাড়িয়ে আগুন নেভাল।

লাফ দিল রানা।

ঝট করে ঘাড় ফেরাল সেন্ট্রি।

লোকটার গলায় একটা হাত পেঁচাল রানা, জোরে ঝাঁকি দিয়ে পিছিয়ে আনল। পচে নরম হয়ে থাকা পাতার স্তূপে পড়ল একে-ফোরটিসেভেন। হাঁপিয়ে ওঠায় প্রথমে রানার হাতটা গলা থেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল সেন্ট্রি, ব্যর্থ হয়ে কনুই গাঁথল ওর পেটে। তার ট্রেনিং মন্দ নয়।

আবার ঝাঁকি দিল রানা, অনুভব করল উত্তেজনা আর

নড়াচড়ায় ওর হাতের পেশিতে ঢেউ উঠছে।

কয়েক সেকেন্ড হাত-পা ছুঁড়ল সেন্ট্রি, তারপর নেতিয়ে পড়ল; জ্ঞান হারিয়েছে। ধীরে ধীরে তাকে মাটিতে নামাল রানা। তার গলায় বাঁধা রুমালটা খুলল ও, গুঁজে দিল মুখের ভিতর। পকেট থেকে নিজের রুমালটা বের করে মুখে বাঁধল, জ্ঞান ফেরার পর প্রথম রুমালটা যাতে ভিতর থেকে বের করতে না পারে।

লোকটার বেল্ট দিয়ে তার পা দুটো বাঁধা হলো। পকেট থেকে একপ্রস্থ নাইলন রশি বের করে কাটল রানা, সেন্ট্রিকে উপুড় করল, তারপর হাত দুটো এক করে বাঁধল। ওর উপস্থিতির কথা এখন আর কাউকে জানাতে পারবে না সে।

তাকে টেনে খানিকটা দূরে আনল রানা, তারপর ঘন ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর ফেলে রাখল। থেঁতলানো পাইন কাঁটার গন্ধে বাতাস ভরে উঠেছে। নিঃশব্দ পায়ে পাইনগাছগুলোর দিকে ফিরছে ও, যেখানে দাঁড়িয়ে ডিউটি দিচ্ছিল সেন্ট্রি।

'টাকসিন!' গাছপালার ভিতর থেকে নরম সুরে ডাকল কেউ। নিশ্চয়ই আরেকজন সেন্ট্রি। 'টাকসিন! কোথায় তুমি? কাছে এসো, সিগারেট ধরাই।'

জায়গামত পৌঁছে ওত পেতে অপেক্ষায় থাকল রানা।

'টাকসিন!' আবার ডাকল লোকটা, গলার স্বরে সামান্য উদ্বেগ।

পায়ের আওয়াজ অস্পষ্ট, চুপিসারে এগোবার চেষ্টা করছে দ্বিতীয় সেন্ট্রি। রশির বাকি অংশটা দু'হাতে ধরে তৈরি হয়ে আছে রানা। এই লোকটাকে কাবু করা সহজ হবে না।

'এখন ইয়ার্কি মারার সময় নয়, টাকসিন!' গলার সুরে এবার রাগ। 'তাইম আনন্দ বলছে...'

রানার মনে পড়ল, বসের কাছ থেকে শোনা নামগুলোর মধ্যে হো টাকসিন ছিল। গাল কাটা জামালের স্বীকারোক্তি অনুসারে,

থাই থান্ডারের প্রথম দলে ছিল সে, টিম লিডার তাইম আনন্দের সহকারী হিসাবে; ওরাই তো ঢাকা এয়ারপোর্টের স্পেশাল হ্যাঙ্গারে ঢুকে ঈগল দুরন্তে আগুন দিয়েছে।

আর দ্বিতীয় দলটা বিজ্ঞানী ডক্টর নাদিরাকে কিডন্যাপ করে এনেছে।

তার মানে, ভাবল রানা, থাই থান্ডারের দুই গ্রুপ এক হয়েছে এখানে।

রশিটা কাছাকাছি গাছের গুঁড়িতে, নীচের দিকে বাঁধল রানা। হামাগুড়ি দিয়ে পাঁচ ফুট দূরের গাছটার কাছে চলে এল, রশির অপরপ্রান্ত বাঁধল এটার নীচের দিকে।

পায়ের আওয়াজ থেমে গেল। হঠাৎ করে সেন্ট্রির সন্দেহ হয়েছে, জঙ্গলে তার সঙ্গী হয়তো টাকসিন নয়।

নিঃশব্দে প্রথম গাছটার কাছে ফিরে এল রানা।

বেশি দূরে নয়, শক্ত কিছুর সঙ্গে আলতোভাবে ঘষা খাচ্ছে ডালপালা। এ লোক জানে সতর্কতার সঙ্গে কীভাবে এগোতে হয়, প্রতিবার পা ফেলতে প্রচুর সময় নিচ্ছে। দিক বদলে ফেলেছে সে, টাকসিনের সেন্ট্রি পোস্টে পৌঁছাতে চাইছে বড় একটা বৃত্ত তৈরি করে।

পচা পাতার উপর পা বুলিয়ে একটা পাইনকোন পেল রানা। তারপর আরও দুটো খুঁজে নিল।

ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে অস্পষ্ট পদশব্দ।

অবশেষে, সেন্ট্রি যখন বাম দিকে চলে এসেছে, টাকসিনের পোস্ট থেকে প্রায় বারো ফুট দূরে, নিঃশব্দে দাঁড়াল বিসিআই এজেন্ট।

প্রথম পাইনকোন দশ ফুট দূরে, দ্বিতীয়টা পনের ফুট আর শেষটা বিশ ফুট দূরে ছুঁড়ল রানা, পালাবার সম্ভাব্য একটা সরল পথের উপর।

শত্রু লেজ তুলে পালাচ্ছে ভেবে পিছু নিল সেন্ট্রি, এখন আর

সাবধানে এগোচ্ছে না– মত্ত একটা জানোয়ারের মত ছুটছে। রানাকে পাশ কাটাল সে, দুই পাইনগাছের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছে।

তার জুতোয় বেঁধে গেল রশিটা। দড়াম করে আছাড় খেল, মুখ থুবড়ে পড়ল পাতার নরম স্তরে। একটা ভোঁতা চিৎকার বেরুতে শুরু করেছিল, পচা পাতায় মুখটা ডুবে যাওয়ায় থেমে গেল। তার পাঁজরে ঝেড়ে একটা লাথি কষল রানা।

একটা গড়ান দিয়ে চিৎ হলো সেন্ট্রি। দু'হাতে ধরা একে-ফোরটিসেভেন চালাল রানার মাথা লক্ষ্য করে। মাথাটা ঝট করে সরিয়ে নিল রানা, হাতের কিনারায় লেগে পিছলে যেতে দিল অস্ত্রটার আঘাত, তারপর লাফ দিয়ে চড়ে বসল সেন্ট্রির ফুলে ওঠা বুকে।

সঙ্গে সঙ্গে রানার নাক বরাবর ধাম করে মোক্ষম একটা ঘুসি চালাল লোকটা।

কান ভোঁ-ভোঁ করছে রানার। মাথা ঝাঁকিয়ে স্বাভাবিক হতে চাইছে ও, নাক ফেটে রক্ত বেরিয়ে এসেছে।

আবার ঘুসি চালাল সেন্ট্রি।

এবার কবজিটা মাঝপথে ধরে ফেলল রানা, ওর নীচে ছায়ায় থাকা মুখটার দিকে তাকিয়ে আছে। সেন্ট্রির ঠোঁট সরে গেল, অন্ধকার জঙ্গলে আইভরির মত জ্বলজ্বল করছে তার দাঁত।

দুজন যোদ্ধা এক মুহূর্ত ওভাবেই স্থির হয়ে থাকল, যেন শক্তি ও দৃঢ়তার প্রতিযোগিতা চলছে।

ঘামছে রানা, ধীরে ধীরে লোকটার মুঠো গায়ের জোরে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে। ঠেকাবার চেষ্টায় পাল্টা শক্তি খাটাচ্ছে সেন্ট্রি, তার গালের মাংস ও চোয়ালের পেশি থরথর করে কাঁপছে।

'কে... তুমি... ?' নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এল প্রশ্নটা।

'বাংলাদেশ,' নরম সুরে বলল রানা। খালি হাতটা দিয়ে ঘুসি মেরে গুঁড়িয়ে দিল লোকটার নাক-চোখ ও চোয়ালের একাংশ।

তার চোখ উল্টে গেল। নিথর হয়ে গেল শরীর।

এর মুখেও কাপড় গুঁজে হাত-পা বাঁধল রানা, সঙ্গী হো টাকসিনের কাছ থেকে পনের ফুট দূরে একটা ঝোপের ভিতর রেখে এল, জ্ঞান ফেরার পরেও যাতে পরস্পরকে সাহায্য করতে না পারে।

আবার ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল রানা, শ্রবণেন্দ্রিয় আগের মতই সজাগ। বাড়ির ভিতর কোথাও থেকে রেডিওর অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে আসছে, সম্ভবত খবর-পাঠকের কণ্ঠস্বর।

খানাখন্দে ভরা ড্রাইভওয়েটা আড়াআড়িভাবে পার হলো রানা। সেটা ধরে ঝোপ-ঝাড় ঘেঁষে আরেকটু এগোতেই তিনতলা বাড়ির পুরোটা দেখতে পেল।

গাছপালার ভিতর দাঁড়িয়ে চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে রানা। খোলা বারান্দাসহ প্রশস্ত একটা কাঠের বাড়ি, দু'পাশ থেকে ধাপ নেমে এসেছে। বাড়িকে ঘিরে থাকা মেঠো পথের দু'পাশে উঁচু ঝোপ ও আগাছা জন্মেছে। চারপাশে প্রচুর পাইনগাছ দেখা যাচ্ছে।

সবগুলো জানালায় আলো দেখছে রানা। ও যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখান থেকে উজ্জ্বল দেখালেও, দূর থেকে গাছপালার বাধা পাওয়ায় ম্লান লাগবে। নীচের হাইওয়ে থেকে কিছুই দেখা যাবে না।

তিনতলায়, পরদা ঢাকা জানালার ভিতর, ছায়ামূর্তির নড়াচড়া দেখতে পাচ্ছে রানা। সাবধানে, নিঃশব্দ পায়ে সামনে বাড়ল। কাঠের বারান্দা ক্যাঁচ ক্যাঁচ করবে, তাই মেটো পথেই থাকছে ও।

বড় একটা জানালার ভিতর লিভিং রুম দেখতে পেল রানা, অয়েলক্লথ ঢাকা টেবিলে বসে রয়েছে দুজন লোক আর এক তরুণী। তাস খেলছে ওরা। এই তরুণীই পিছু নিয়েছিল উত্তরা উৎকর্ণার।

এখন তাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা, চিনতেও কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। চক্রি চুয়ানের বান্ধবী সে, চিত্রলেখা মাহিদল; থাই থান্ডারের তরফ থেকে দোই ইনথানন দুর্গে গিয়েছিল থাই টঙের সঙ্গে সমঝোতা বৈঠকে যোগ দিতে।

দাঁড়াল চিত্রলেখা। নড়াচড়ায় ক্ষিপ্র ভাব। সুন্দরী সে, সন্দেহ নেই। তবে চেহারা দেখেই বোঝা যায়, দেমাকে যেন মাটিতে পা পড়ে না। লাল স্কার্ট ও সাদা টি-শার্ট পরেছে, চেয়ারের পিঠে একটা মিঙ্ক কোট। রেডিওর কাছে হেঁটে গিয়ে আওয়াজটা বাড়িয়ে দিল ও।

ইংরেজি খবর হচ্ছে: 'ভয়ংকর মাফিয়া সংগঠন থাই থান্ডার বাংলাদেশী বিজ্ঞানী ডক্টর নাদিরাকে ফিরিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে বেইজিং সরকারের কাছ থেকে দুশো মিলিয়ন ইউএস ডলার মুক্তিপণ চেয়েছে...'

চিত্রলেখার গম্ভীর মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটল, আদর করবার ঢঙে রেডিওর গায়ে চাপড় মারল সে। বাকি তিনজন হেসে উঠল।

তবে খবর এখনও শেষ হয়নি: 'এদিকে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, মহাচিন কঠিন ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করায় আশপাশের অন্তত তিনটে দেশের সরকার পুলিশকে থাই থান্ডারের বিরুদ্ধে চিরনি অভিযান চালাবার নির্দেশ দিয়েছে। এরই মধ্যে থাই থান্ডারের অন্তত দেড়শো গুণ্ডাকে ধরে জেল-হাজতে ভরা হয়েছে...'

নিঃশব্দে এগোচ্ছে রানা, লিভিং রুমকে পাশ কাটিয়ে এল। আরেক কামরার ভিতর তিনজন লোক টেবিলে বসে সরাসরি বোতল থেকে বিয়ার খাচ্ছে, কী বিষয়ে যেন গভীর আলোচনায় মগ্ন।

পরের জানালার কাঁচ আংশিক অস্বচ্ছ, ওটা সম্ভবত বাথরুম।

তৃতীয় জানালার ভিতর একা প্রৌঢ়া এক ভদ্রমহিলাকে দেখল

রানা, কাঠের চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে।

তাঁর মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, হয় জ্ঞান না থাকায়, নয়তো ক্লান্তিতে। ব্লাউজ দু'এক জায়গায় ছেঁড়া, মেঝেতে লুটাচ্ছে নীল জর্জেট শাড়ির আঁচল। বড় করে শ্বাস নিল রানা। বিজ্ঞানী ডক্টর নাদিরাকে পেয়েছে ও। এই সময় আওয়াজটা ওর পিলে পর্যন্ত চমকে দিল।

জঙ্গল থেকে ভেসে আসছে বহু লোকের পায়ের শব্দ। নীরবেই এগোবার চেষ্টা করছে, কিন্তু সংখ্যায় অনেক বেশি ওরা। এত তাড়াতাড়ি পুলিশ আসতে পারে না, ভাবল রানা। তা হলে কারা ...?

জানালার সামনে থেকে পিছু হটছে রানা, তাকিয়ে আছে ডক্টর নাদিরার দিকে। স্থির ও চুপচাপ রয়েছেন তিনি, জানেন না তাঁকে নিয়ে কী রোমহর্ষক নাটক অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

পায়ের আওয়াজ দ্রুত হলো। ছুটে কাছে চলে আসছে ওরা। বড়সড় একটা ঝোপের ভিতর ঢুকে পড়ল রানা, হাতে বেরিয়ে এসেছে প্রিয় অস্ত্র ওয়ালথার।

'বা-বাম দিকে!' কর্কশ একটা কণ্ঠস্বর হিসহিস করে উঠল। 'তুমি ডা-ডানে যাও! বাঁক ঘুরে! পে-পেছনে যাও!'

ঝোপের ভিতর নড়ছে না রানা, হাতে পিস্তল। ওর মনে পড়ল, এই তোতলা লোকটার কণ্ঠস্বর আগেও শুনেছে। থাই থান্ডারের বেযমেন্টে যখন বন্দি ছিল ও, থাই টং তখন ওখানে হামলা চালায়, তাদের সঙ্গে ছিল লোকটা।

থাই থান্ডারের সেফ হাউসে তা হলে আবার হামলা চালাতে যাচ্ছে থাই টং।

একটু পরেই শুরু হয়ে গেল তুমুল গুলিবর্ষণ। শান্ত, পাহাড়ি এলাকা কেঁপে কেঁপে উঠছে। ট্রেসার বুলেটগুলো আলোর রেখা তৈরি করে আঘাত করছে বাড়িটার গায়ে।

তিন

ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে বুলেটের মতই ছুটল রানা। অকস্মাৎ ওর সামনে পড়ে গেল থাই টঙের একজন খুনি। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাওয়ায় হাতের কারবাইন তাক করতে দেরি করে ফেলল লোকটা। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে তার ঘামে ভেজা হলদেটে কপালে একটা লাল টিপ পরিয়ে দিল রানার হাতের ওয়ালথার।

পড়ে যাচ্ছে লোকটা, কারবাইন ছেড়ে দিয়েছে। ঝট্ করে হাত বাড়িয়ে সেটা ধরে ফেলল রানা।

ওয়ালথারটা নিজের জায়গায় ফিরে গেল, ওর হাতে এখন অটোমেটিক কারবাইন। চারদিকে শত্রু, দু'দলে যুদ্ধ লেগে গেছে, এরকম সময়ে হাতে একটা রাইফেল থাকা দরকার।

লাফ দিয়ে রেইলিং টপকে বারান্দায় চড়ল রানা, আরেক লাফ দিল জানালা লক্ষ্য করে– ওটার ভিতরই ডক্টর নাদিরাকে বেঁধে রাখা হয়েছে।

কাঁধের ধাক্কায় ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল জানালার কাঁচ, ওগুলোর পিছু নিয়ে কামরার মেঝেতে নামল রানা। ডক্টর নাদিরা ধীরে ধীরে মাথাটা তুললেন, ঝাপসা দৃষ্টি কাটিয়ে ওঠার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁর মাথাটা আবার নেতিয়ে পড়ল সামনের দিকে।

সিধে হলো রানা, কাঁধটা এক হাতে ডলতে ডলতে সামনে এগোল। থাই থান্ডারের সেফ হাউস হুঙ্কার, আর্তনাদ ও গোলাগুলির আওয়াজে অনবরত কাঁপছে।

দড়াম করে কামরার দরজা খুলে যেতে রানার বুকটাও কেঁপে উঠল। সেদিকে বন্ করে ঘুরল ও, ওর সঙ্গে ঘুরে গেছে কারবাইনের নলও। চৌকাঠ পার হয়ে কামরার ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছে থাই থান্ডারের লিডার, চক্রি চুয়ান।

এই চক্রি চুয়ানই ঢাকায় গিয়ে বিজ্ঞানী ডক্টর নাদিরাকে কিডন্যাপ করেছে, তাঁর বোনকে হত্যা করেছে, আগুন দিয়েছে এয়ারপোর্টের হ্যাঙ্গারে।

পরস্পরকে দেখে দুজনেই চমকাল। গুলিও চালাল দুজন প্রায় একইসঙ্গে। চক্রি চুয়ানের পিস্তল গর্জে উঠল, গুলিটা রানার একেবারে কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

আধ সেকেন্ড আগে রানা করেছে ব্রাশফায়ার। বুলেটগুলো সেলাই-এর ফোঁড় তৈরি করছে। ঘুরে গেল চুক্রি চুয়ান, যেন হাতের কাজটা দেখে রানাকে তৃপ্তি পেতে দিতে রাজি নয়, পিস্তল ফেলে দু'হাত দিয়ে পেট চেপে ধরে বসে পড়ল, তারপর ঢলে পড়ল একপাশে।

নিষ্ঠুর এক চিলতে হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে, জানে পনেরো-বিশটা বুলেট খেয়ে খুব বেশিক্ষণ টিকবে না লোকটা। পিস্তলটা তুলে নিয়ে পকেটে ভরল ও, তারপর দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে ফিরে এল ডক্টর নাদিরার কাছে।

ছুরি বের করে বিজ্ঞানীর বাঁধনগুলো কাটল ও। ওর হাতের ভিতর ঢলে পড়ল শরীরটা। ছোট্ট কাঠামো, হালকা। মুখে আঁচড়ের দাগ, একটা চোখের চারপাশ কিছুটা ফুলে কালচে হয়ে আছে।

বাড়ির ভিতর ছুটোছুটি করছে বুট পরা কয়েক জোড়া পা। দিকভ্রান্ত কয়েকটা বুলেট দেয়াল ফুটো করে ছোট কামরাটার ভিতর ঢুকে চেয়ারের খাড়া পিঠ ভেঙে ফেলল, যে চেয়ারটায় বেঁধে রাখা হয়েছিল ডক্টর নাদিরাকে।

তাঁকে নিয়ে জানালার সামনে চলে এল রানা, লাথি মেরে

আরও কিছু কাঁচের টুকরো ঝরাল।

জানালার পাশে একটা ক্লজিট, রানাকে চমকে দিয়ে সেটার ভিতর থেকে আওয়াজ বেরিয়ে এল। বন্ধ কবাটের গায়ে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মারছে কেউ। তারপর ক্ষুব্ধ গলা শোনা গেল, কে যেন হিন্দি ও বাংলায় বলল, 'ইয়ে দরওয়াজা তোড় দো! ভাঙ শালার দরজা– ভাঙ! ভাঙ!' তারপর সুর করে শুরু হলো, 'লাথি মার, ভাঙরে তালা...'

আবার ধাক্কা লাগায় থরথর করে কেঁপে উঠল ক্লজিটের কবাট আর পাশের দেয়াল।

'মানস!' দরজার হাতল ধরে ঘোরাল রানা। ঘুরল না, তালা দেওয়া।

'সেলাম, হুজুর! নমস্তে, সার! আরে, দাদা নাকি?'

'অপেক্ষা করুন!'

ঘুরে চেয়ারটার কাছে ফিরে এল রানা, ধীরে ধীরে ডক্টর নাদিরাকে আবার বসাল ওটায়। দ্রুত হাতে পকেট থেকে টুথপিক বের করে ক্লজিটের তালা খুলে কবাট ফাঁক করল। ভিতর থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল মানস ঘোষ।

হাত দুটো রানার বুকে পেঁচাল সে, মেঝেতে ছড়িয়ে থাকা কাঁচের টুকরোগুলোকে গ্রাহ্য না করে রানাকে নিয়ে সারা ঘরে এক পাক নাচছে।

'আরে, ছাড়ুন! আহ্, কী করছেন!'

'ধন্যবাদ, মা দুর্গা, থ্যাঙ্কিউ!' অদৃশ্য দেবীর উদ্দেশে দু'হাত এক করে কপালে ঠেকাল মানস। 'কত বড় ভাগ্য নিয়ে জন্মেছি, স্বনামধন্য মাসুদ রানা স্বয়ং আমাকে উদ্ধার করলেন!'

'মানস, আপনার পাগলামি থামান! পালাতে না পারলে মারা পড়ব!' নিজেকে ছাড়িয়ে আবার ডক্টর নাদিরাকে পাঁজাকোলা করে বুকের কাছে তুলে নিল রানা।

'আহা, কী ভক্তি!' আবেগে আপ্লুত কণ্ঠে বলল মানস, ঘুরে

জানালা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। 'আপনি হিন্দু হলে বলতাম, ডক্টর নাদিরাকে তো নয়, এ যেন স্বয়ং মা দুর্গাকে বুকে তুলে নিয়েছেন। তার বদলে বলতে ইচ্ছে করছে– আহা, কী দেশপ্রেম, যেন জননী জন্মভূমিকে বুকে তুলে নিয়েছেন!'

তার কথায় কান নেই রানার। 'আমি ভেবেছিলাম আপনি বুঝি মারা গেছেন,' মাথা নিচু করে জানালা গলে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বলল ও।

'কক্ষনো না!' বারান্দায় বেরিয়ে এসে বলল মানস। 'আমার মা, দিদি আর ভোলার অনুমতি নেই। ওরা আমাকে ভালবাসে না!'

'সাবধান!' খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে মানসকে সতর্ক করল রানা। 'চারদিকে থাই থান্ডার আর থাই টং ছুটোছুটি করছে।'

মাথাটা একদিকে কাত করল মানস। গোলাগুলির আওয়াজ ক্রমশ কমে আসছে। ফার্নিচার ভাঙচুরের আওয়াজ ভেসে এল। তারপর ভারী কিছু পতনের কম্পন অনুভব করল। কেউ একজন কাউকে গালি দিল। তীব্র ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল আরেক লোক।

'আনআর্মড কমব্যাট শুরু হয়েছে,' বলল মানস, তারপর খানিকটা কসরত করে রেইলিংটা টপকাল। 'দিন, দাদা, ওঁকে আমার কাছে দিন...'

রেইলের উপর দিয়ে ডক্টর নাদিরাকে মানসের হাতে তুলে দিল রানা।

'থাই টং?' জিজ্ঞেস করল মানস। 'শালা থান্ডাররা রুম সার্ভিসের কথা বলে হোটেল স্যুইটে ঢুকে কাবু করল আমাকে, তারপর কী একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে বেহুঁশ করে ফেলল। ওদের সঙ্গে একটা অ্যামবুলেন্সও ছিল, নিশ্চয়ই থাইল্যান্ড থেকে আনিয়েছে, তাই না? সীমান্ত তো কাছেই। ভাল কাভার, কি বলেন?'

'তা বটে,' রেইলিং টপকে বলল রানা। 'গাছগুলোর ভেতর দিয়ে পথ আছে। আমার পিছু নিন।'

'ওস্তাদ, আমার কাছেও একটা তথ্য আছে,' বলল মানস। 'থাই থান্ডারদের মুখে শুনলাম গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সও থাইল্যান্ডে ঢুকে পড়েছে, কিংবা ঢুকতে যাচ্ছে।'

'সব ব্যাপারে ছোঁক ছোঁক করা ওদের একটা বাজে অভ্যাস,' বলল রানা। 'থাইল্যান্ডে কী চায় ওরা?'

'সুযোগ পেলে তার সদ্ব্যবহার করতে চায়,' বলল মানস।

'বুঝলাম না।'

'শোনা যাচ্ছে পিসিআই নাকি দুটো গ্রুপ পাঠিয়েছে। একটা গ্রুপ কমান্ডোদের নিয়ে তৈরি, তাদের কাজ ডক্টর নাদিরা কিংবা তাঁর ডেভেলাপ করা প্লেনের কাছে কেউ পৌঁছাতে চাইছে দেখলে বাধা দেয়া,' বলল মানস। 'ওদের দ্বিতীয় গ্রুপটায় কয়েকজন পাইলট ও বিজ্ঞানী আছে, তাদের কাজ কোনও ভাবে সুযোগ করে নিয়ে রহস্যময় প্লেনটাকে থাইল্যান্ড থেকে করাচীতে নিয়ে যাওয়া। তা নিয়ে যেতে পারলে প্লেনটার ইউনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা পাবে তারা। পিসিআই ধরেই নিয়েছে ওই প্লেনটা আসলে ডক্টর নাদিরার ডেভেলাপ করা দুরন্ত ঈগল।'

'বাহ্, শালারা যেন মগের মুল্লুক পেয়েছে!'

কবজিতে জড়ানো হাতঘড়ি কাঁপছে, অনুভব করে চট করে আড়চোখে একবার রানাকে দেখে নিল মানস। না, কিছুই টের পায়নি রানা।

জোরে জোরে শ্বাস ফেলল মানস, যেন কষ্ট পাচ্ছে। তাড়াতাড়ি ওর হাত থেকে ডক্টর নাদিরাকে নিজের হাতে তুলে নিল রানা।

রানাকে অনুসরণ করছে মানস, তবে অলস পায়ে। ক্রমশ

পিছিয়ে পড়ছে ও। ছোট একটা ডোবাকে পাশ কাটাবার সময় দাঁড়িয়ে পড়ল, কিনারা থেকে নীচে নামতে যাচ্ছে। 'আপনি এগোন, ওস্তাদ,' গলা চড়িয়ে বলল, ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে। 'এমন এক তাগাদা অনুভব করছি, সাড়া না দিয়ে পারা যায় না।' একটু পরপরই হাতঘড়িটা কাঁপছে।

রানা বিরক্ত। এমন বিপদের সময় প্রকৃতির ডাক অগ্রাহ্য করতে পারে না, এ কেমন এসপিওনাজ এজেন্ট! ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও, কিন্তু ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে ছোটখাট লোকটা কোথায় বসেছে ঠাহর করতে পারল না।

অচেতন ডক্টর নাদিরাকে কাঁধে নিয়ে সাবধানে এগোচ্ছে রানা। একটু সন্দেহ হচ্ছে ওর, মানস কি ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে? রাখবারই কথা, তাতে ওর কিছু মনে করা উচিত নয়।

ওদিকে ডোবার কিনারায় বসে হাতঘড়ির একটা বোতামে চাপ দিল মানস ঘোষ। ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিস হেডকোয়ার্টার থেকে কর্মকর্তাদের কেউ ওর সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন।

শক্তিশালী রেডিওটা অন হলো। 'ইয়েস, সার। মানস ঘোষ স্পিকিং, সার।'

ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিস, নতুন দিল্লি।

ডিরেক্টর রমেশ ঠাক্‌রে-র চেম্বার। সাউন্ডপ্রুফ কামরার ভিতর, কার্পেটের উপর অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন তিনি। ছোট্ট টু-ওয়ে রেডিও সেটটা কানের কাছে তুলে কথা বলছেন তরুণ এজেন্ট মানস ঘোষের সঙ্গে।

'দিস ইজ অ্যান ইমারজেন্সি, মানস,' বললেন রমেশ ঠাক্‌রে। 'কাজেই নতুন নির্দেশগুলো মন দিয়ে শোনো।'

'ইয়েস, সার!' আনুগত্য প্রকাশ পেল মানসের কথায়।

'তুমি তো জানোই যে পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স দুরন্ত

ঈগলকে করাচীতে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছে।'

'আজ্ঞে, সেরকমই শুনছি, সার।'

'এরকম পরিস্থিতিতে আমরা চুপ করে বসে থাকতে পারি না,' রমেশ ঠাক্‌রে বললেন। 'থাই সরকারের সঙ্গে কথা হয়েছে আমাদের। কথা হয়েছে ফার্স্ট পার্টির সঙ্গেও। কেউ কিছু স্বীকার করতে চাইছে না, বলছে আমরা যা শুনেছি তার সবই নাকি নিছক গুজব। কিন্তু ওরা যাই বলুক, আমাদের নিজস্ব স্যাটেলাইট ফটো তো আর মিথ্যে কথা বলছে না! কাজেই দোই ইনথাননে আমাদেরও থাকা দরকার। ইতিমধ্যে দুটো টিম রওনা হয়ে গেছে। তার মধ্যে একটা টেকনিকাল টিম, সদস্যদের মধ্যে বিজ্ঞানী আর পাইলটরা আছে।'

মানস উদ্বিগ্ন। 'আমাদের টিম ওখানে গিয়ে কী করবে, সার?'

'ওদের প্রথম কাজ, সুযোগের সন্ধানে থাকা। যখনই দেখবে সম্ভব, অমনি ছোবল হানবে।'

দু'সেকেন্ড বোবা হয়ে থাকল মানস। 'ছোবল মারবে, সার? ছোবল মারবে কাকে?'

রেগে গেলেন রমেশ ঠাক্‌রে। 'তুমি বোকার মত প্রশ্ন করছ, মানস। ছোবলটা মারা হবে প্লেন এবং ডক্টর নাদিরাকে ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে, প্লেন ও ডক্টর নাদিরা সেই মুহূর্তে যাদের কাছে থাকবে তাদেরকেই মারতে হবে– এই সহজ কথাটা তুমি বুঝতে পারছ না?'

'কিন্তু, সার, আপনি আমাকে ব্রিফ করার সময় বলেছিলেন, অন্তত এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও চিনকে আমরা স্বেচ্ছায় নিঃশর্তভাবে সাহায্য করছি, এখানে আমাদের অন্য কোনও স্বার্থ নেই।'

'তখন কী বলেছিলাম ভুলে যাও, মানস,' শান্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন রমেশ ঠাক্‌রে। 'চিন অস্থির, বাংলাদেশ অস্থির,

এরকম আঁচ পেয়েই তোমাকে পাঠানো হয়েছিল ওয়াচ করার জন্যে। তোমার পাঠানো রিপোর্ট এবং অন্যান্য সূত্র থেকে এখন আমরা জানতে পেরেছি আসলে কী ঘটছে। কাজেই এখন এটা সম্পূর্ণ নতুন একটা অ্যাসাইনমেন্ট। তোমাকে আমি ব্রিফ করছি।'

আধ সেকেন্ড ইতস্তত করে মানস সাড়া দিল: 'ইয়েস, সার... নো, সার!'

'এক্সপ্লেইন ইওরসেলফ!' প্রায় গর্জে উঠলেন রমেশ ঠাক্‌রে।

'সার,' দৃঢ়কণ্ঠেই বলল মানস, 'আমাকে যে অ্যাসাইনমেন্টে পাঠানো হয়েছে তাতে আমার নৈতিক সমর্থন ছিল। কিন্তু এই নতুন অ্যাসাইনমেন্টে আপনি আমাকে দিয়ে ঠিক কী করাতে চান...'

নরম সুরে হাসলেন রমেশ ঠাক্‌রে। 'খুব কঠিন কয়েকটা কাজই তোমাকে দেয়া হচ্ছে, মাই ডিয়ার সান। তুমি একজন ট্রেনিং পাওয়া কিলার, মানস, অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট দ্যাট এভার, ওকে?'

'ইয়েস, সার, বাট...'

মানসকে কথা বলতে না দিয়ে বলে চলেছেন রমেশ ঠাক্‌রে, 'আমাদের কৌশল কাজে লেগেছে, বর্তমান সময়ের সেরা এক এসপিওনাজ এজেন্টের কাছাকাছি থাকার সুযোগ করে নিতে পেরেছ তুমি, এরচেয়ে বড় সুখবর আর কিছু হতে পারে না। ওই মাসুদ রানাকে তুমি পরপারে পাঠাবে...'

'অসম্ভব, সার। এ আপনি কী বলছেন! তিনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন...'

'কোথায়? সিঙ্গাপুরের বিগ ডিল-এ তো?' আবার হাসলেন রমেশ ঠাক্‌রে। 'ওখানে মাসুদ রানা তোমার প্রাণ বাঁচায়নি। কীভাবে বাঁচাবে, প্রাণ হারাবার মত কোনও বিপদ ওখানে তোমার হলে তো!'

‘মানে, সার?’ বিভ্রান্ত বোধ করছে মানস। ‘আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।’

‘ওটা ছিল আমাদের সাজানো নাটক,’ বললেন রমেশ ঠাক্রে। ‘যারা তোমাকে মারধর করছিল তারা আমাদেরই ভাড়াটে গুণ্ডা। স্রেফ অভিনয় করছিল, সত্যি সত্যি মারলে তোমাকে খুঁজে পাওয়া যেত ভেবেছ?’

‘ও ভগবান!’ মানস শুধু হতবিহ্বল নয়, ব্যাপারটা বিশ্বাসও করতে পারছে না। ‘এ কী শুনছি আমি!’

‘ঠিকই শুনছ। মাসুদ রানা খুব নরম প্রকৃতির মানুষঃ কারও ওপর অত্যাচার সহ্য করতে পারে না, এটা আমাদের জানা আছে। নিজের প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিয়ে আমাদের কয়েকজন এজেন্টকে আগেও বাঁচিয়েছে ও নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে। নাটকটা এমনভাবে সাজানো হয়, ও যাতে তোমার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। হয়েছেও ঠিক তাই।’

‘আমাকে কিছুই না জানিয়ে এ-সব করতে গেছেন... কাজটা ভাল করেননি, সার,’ বলল মানস। ‘এতে আমার নৈতিক সমর্থন নেই। তা ছাড়া...’

‘ইয়েস, মানস?’

‘এত কাঠ-খড় পুড়িয়ে আমার প্রতি মাসুদ রানার মনে সহানুভূতি জাগাবার কী দরকার ছিল?’ জিজ্ঞেস করল মানস। ‘ওই গুণ্ডাগুলোকে দিয়ে তাকে মেরে ফেললেই তো পারতেন– সেটাই যখন আপনার ইচ্ছে।’ মার খাওয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতাটা মনে পড়ে গেল ওর। অসম্ভব! ভাবল সে, সাজানো নাটক হলে ওভাবে কেউ কাউকে মারে? মাসুদ রানা ঝাঁপিয়ে না পড়লে আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ও তো মারাই যাচ্ছিল!

পরিষ্কার বুঝল সে, বস্ সত্যি কথা বলছেন না।

‘ওহ্, নো!’ বললেন ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের ডিরেক্টর। ‘মারবে তো বটেই, তবে তার আগে ওকে দিয়ে নিজেদের

স্বার্থটা উদ্ধার করে নিতে হবে তোমাকে।'

'কী স্বার্থ, সার?' মানসের নিজের কানেই কণ্ঠস্বরটা কর্কশ শোনাল। 'কী করতে হবে আমাকে?'

'তার আগে মনে করিয়ে দিই– ভারতমাতার স্বার্থই তোমার স্বার্থ। আর সেটা চরিতার্থ করা হবে তুমি যদি ওই বিরল মেধার অধিকারী বিজ্ঞানী ডক্টর নাদিরা আর রহস্যময় প্লেনটাকে থাইল্যান্ড থেকে হিন্দুস্তানে নিয়ে আসতে সাহায্য করো। আমরা এর কলকব্জা ও নির্মাণকৌশল বুঝে নিয়ে আমেরিকার হাতে তুলে দেব প্লেনটা–নাদিরাকেও।'

হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারছে না মানস। 'কী করে তা সম্ভব, সার?'

'খুব সহজে,' রেডিওর অপরপ্রান্ত, অর্থাৎ নতুন দিল্লি থেকে বললেন রমেশ ঠাক্‌রে। 'আমাদের প্রথম টিমের সদস্য সংখ্যা আট, দুজন স্পাই ছাড়া সবাই তারা বিজ্ঞানী ও পাইলট। দ্বিতীয় টিমের সদস্য মাত্র একজন। দেখতে অবিকল মাসুদ রানা। ছদ্মবেশের সাহায্যে নিয়ে আরও নিখুঁত করা হবে চেহারাটা।

'তার নাম উদয় চ্যাটার্জি। তোমার কাজ হবে ঠিক সময় মত মাসুদ রানাকে মঞ্চ থেকে আউট করে দেয়া, উদয় চ্যাটার্জি যাতে ইন করতে পারে। বাকিটা টেকনিকাল টিমের সাহায্য নিয়ে যা করার সে-ই করবে।'

'যা করার, সার? সেটা কী, একটু বিস্তারিত বলবেন, প্লিজ?' গলার আওয়াজ স্বাভাবিক রাখতে গলদঘর্ম হয়ে যাচ্ছে মানস।

মৃদু শব্দে হাসলেন ঠাক্‌রে। তারপর বললেন, 'ব্যাপারটার মধ্যে লালচিনের স্বার্থ ষোলোআনা। কাজেই ধরে নেয়া যায় মাসুদ রানাকে সাহায্য করবে চিনা সিক্রেট সার্ভিস। প্রতিদ্বন্দ্বী পরাশক্তি দুরন্ত ঈগলকে নিয়ে দুনিয়ার আরেক মাথায় চলে যাবে, চিনা এয়ার ফোর্সও এটা মেনে নেবে না। গুরুত্বপূর্ণ সব ফ্যাক্টর মনে রেখে হিসেব করলে দেখতে পাবে– ওদের সাহায্য নিয়ে

মাসুদ রানাই দুরন্ত ঈগলকে উদ্ধার করবে। সম্ভবত সে-ই ওটাকে নিয়ে যাবে বেইজিঙে। এবার কল্পনা করো, মাসুদ রানা মনে করে চিনারা সাহায্য করছে উদয় চ্যাটার্জিকে।'

কল্পনা করতে গিয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠল মানস। রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল, 'তারপর?'

'রানাকে চিনারা বিশ্বাস করে, কাজেই তার ওপর ওদের নজরদারি থাকবে না,' বললেন রমেশ ঠাক্রে। 'সেই সুযোগে রানা, অর্থাৎ উদয়, মাঝ আকাশ থেকে প্লেনটা হাইজ্যাক করে নিয়ে আসবে ইন্ডিয়ায়।'

কঠিন কাজ, তবে অসম্ভব নয়, উপলব্ধি করল মানস। প্ল্যানটা ভাল, কাজ হবে কি না নির্ভর করছে উদয়ের উপর– রানার ভূমিকায় কতটা সফল অভিনয় করতে পারবে, স্পাই হিসেবে তার ব্যক্তিগত দক্ষতা কতটুকু, তার উপর। 'চিনা ক্রু ও এজেন্টদের খুন করে?' জিজ্ঞেস করল মানস।

'এ-সব বাহুল্য প্রশ্ন কেন করছ বুঝছি না!' বিরক্ত হলেন ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের ডিরেক্টর। 'প্রয়োজনে খুন তো করতেই হবে– উদয়কেও, তোমাকেও। প্ল্যানটা কেমন লাগল, কোনও খুঁত পাচ্ছ কি না, সেটা বলো।'

'শুনেছি মাসুদ রানা একাই একশো,' বলল মানস। 'তার পক্ষেও এই অ্যাসাইনমেন্ট সফল করা সম্ভব কি না বুঝতে পারছি না। উদয় সম্পর্কে কিছুই না জেনে কী বলতে পারি, সার!'

'উদয়ের সফল হবার সম্ভবনা হানড্রেড পার্সেন্ট,' বললেন রমেশ ঠাক্রে। 'কারণ মাসুদ রানা তো একা, উদয়ের সঙ্গে আমাদের অন্যতম সেরা একজন এজেন্ট আছে–তুমি।'

নিজের প্রশংসা শুনে খুশি হতে পারল না মানস। 'মাসুদ রানাকে আউট করা মানে তাকে খুন করা।' অনেকটা আপন মনে মন্তব্য করল সে।

'অভকোর্স!'

‘সার, এটা সম্ভব নয়...’

‘দ্যাট’স অ্যান অর্ডার, মানস!’

চুপ করে আছে মানস।

‘তুমি কিছু বলছ না,’ অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা সুরে বললেন রমেশ ঠাক্‌রে।

‘সার,’ বলল মানস, তার কণ্ঠও শান্ত। ‘আমি এই মুহূর্তে কাজে ইস্তফা দেয়ার কথা ভাবছি।’

‘কিন্তু কোনও অ্যাসাইনমেন্টে কর্মরত অবস্থায় তা তুমি পার না,’ বললেন আইএসএস ডিরেক্টর। ‘সেরকম কিছু করলে তোমার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ আনা হবে, কিংবা...’

জানা থাকায় শূন্যস্থানটা মানসই পূরণ করল, ‘...ডিউটিতে থাকার সময় অ্যাক্সিডেন্টালি মারা যাব।’ তার জানা আছে, এরকম পরিস্থিতিতে আজ পর্যন্ত কাউকে বাঁচিয়ে রাখা হয়নি।

এবার অপরপ্রান্তে রমেশ ঠাক্‌রে চুপ করে থাকলেন।

মানসের মাথার ভিতর চিন্তার ঝড় বইছে। মাসুদ রানা নিজের জীবনের মায়া করেননি, গুণ্ডাদের হাত থেকে আমাকে বাঁচাবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। যে-কোনও দুই দেশের এসপিওনাজ এজেন্টরা পরস্পরের শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বী, এটা সবাই জানে, অথচ আমাকে বারবার বিপদ থেকে বাঁচিয়েছেন তিনি। এই ঋণ আমার শোধ করা উচিত না? উচিত নয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা? কিন্তু আরেকদিকে আমার জন্মভূমি– ভারতমাতা– এবং বস্ রমেশ ঠাক্‌রের নির্দেশ। বড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল সে। ‘ঠিক আছে,’ ঝাড়া বিশ সেকেন্ড পর মানসই নীরবতা ভাঙল। ‘বলুন, সার, আর কী করতে হবে।’

‘কী করতে হবে সেটা তোমাকে বলা হয়েছে। কখন কীভাবে করতে হবে, সে-সব তোমাকে আমরা সময় মত জানাব,’ বললেন রমেশ ঠাক্‌রে। ‘তবে মনে রাখবে যে ব্যাপারটার সঙ্গে

একাধিক পরাশক্তি জড়িত, কাজেই প্রতিটি কাজ সাবধানে সারতে হবে তোমাকে।'

'আপনি আমাকে এখনই নির্দেশ দিচ্ছেন না কেন, মাসুদ রানাকে মেরে ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতাম?' জানতে চাইল মানস।

'না-না, কাজটা সময়মত করতে হবে,' তাড়াতাড়ি বললেন রমেশ ঠাক্‌রে। 'আমাদের টিম দুটো দোই ইনথানন দুর্গ পেনিট্রেট করতে পারল কি না তার ওপর নির্ভর করছে পরবর্তী পদক্ষেপ। আমরা আশা করছি, দুর্গ এলাকায় পৌঁছাবার পর তুমি নিজেই বুঝতে পারবে মাসুদ রানাকে কখন তোমার সরাতে হবে–হয়তো দেখতে পাবে একই চেহারা নিয়ে দুজন লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

'বেশ।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মানস। 'কিন্তু, ধরুন, উদয় দুর্গ এলাকা পেনিট্রেট করতে পারল না। তখন কী হবে?'

'সব প্ল্যানেরই একটা ব্যাক-আপ থাকা উচিত, থাকে, এটারও আছে,' বললেন রমেশ ঠাক্‌রে। 'একটা প্ল্যান কাজ করবে না বুঝতে পারলে আরেকটা প্ল্যান ধরে এগোতে হবে। সেজন্যেই মাসুদ রানাকে তুমি এখনই সরাতে পার না।'

'ব্যাক-আপ প্ল্যানটা কী, সার?'

'সেটা সময় মত জানানো হবে তোমাকে।'

'বেশ।'

'আরেকটা কথা, মানস,' প্রসঙ্গ বদলে বললেন রমেশ ঠাক্‌রে। 'তোমার কুকুর, ভোলা।'

শিরদাঁড়ায় শিরশিরে একটা ভাব অনুভব করল মানস। ভোলা তার পোষা, আদর করে ট্রেনিং দেওয়া কুকুর। 'ইয়েস, সার? কী হয়েছে ভোলার?'

হাসলেন রমেশ ঠাক্‌রে। 'তোমাকে দেখতে না পেয়ে খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিয়েছে ভোলা। ভাবলাম তোমার কাজে

লাগতে পারে, তাই ওকে তোমার কাছে পাঠাচ্ছি। ওর খাবার নিয়ে এক লোক ইতিমধ্যে রওনা হয়ে গেছে, বলে দিচ্ছি কোথা থেকে কালেক্ট করতে হবে,' বললেন আইএসএস-এর ডিরেক্টর।

'ও, আচ্ছা,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মানস। 'ভালই করেছেন, ভোলাকে হয়তো দরকার হতে পারে আমার।'

'আরেকটা কথা,' বললেন রমেশ ঠাক্‌রে। 'খবরদার, মানস, ওই ভদ্রমহিলার যেন কোনও ক্ষতি না হয়! রানা যেমন তাঁর যত্ন নিচ্ছে, তুমিও ঠিক সেরকম যত্ন নেবে। মনে রাখবে, দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের একজন তিনি, তাঁর বিরল মেধা কাজে লাগিয়ে ভারতমাতাকে আরও এগিয়ে নিতে চেষ্টা করব আমরা।'

'জী?' অসহায় বোধ করছে মানস, নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে ভয়ও পাচ্ছে। 'জী।'

সন্তুষ্টির হাসি হাসলেন রমেশ ঠাক্‌রে। 'আই উইশ ইউ গুড লাক, মাই বয়। তবে আরেকটা কথা, মাই ডিয়ার।'

'জী, বলুন, সার।'

'আমাদের দুই টিমের প্রত্যেকে জানে এটা তাদের সুইসাইড মিশন। তোমার ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়, তোমাকে কোনও সুইসাইডাল মিশনে পাঠানো হয়নি। এরকম পরিস্থিতিতে, ভগবান না করুন, ধরো মিশনটা ব্যর্থ হলো। সেক্ষেত্রে কী হবে? ওরা তোমাকে দায়ী বলে ভাববে না?'

একটা ঢোক গিলল মানস। কিছু বলতে যাবে, অনুভব করল যোগাযোগ কেটে দিয়েছেন রমেশ ঠাক্‌রে।

খানিক দূর এগিয়ে ইতস্তত করল রানা, তারপর ট্রেইলের পাশে কয়েকটা গাছের আড়ালে মানসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকল। খুব বেশি দেরি করেনি সে, পাঁচ-সাত মিনিটের মাথায় ফিরে এল।

রানা ওর জন্য অপেক্ষা করছে দেখে অমায়িক হাসি ফুটল

মানসের মুখে। 'দুঃখিত, বুঝলেন না!'

বুঝব না কেন, মনে মনে বলল রানা, তোমার আচরণ সন্দেহজনক। মুখে বলল, 'চেহারা দেখে মনে হচ্ছে আপনি সুখি নন।'

'আরে, মশাই, আপনি সবজান্তা নাকি?' বেসুরো গলায় হেসে উঠল মানস। 'সত্যিই আমি সুখি নই!'

'কেন জানতে পারি?' প্রশ্ন করল রানা।

'আর সময় পেল না, ডোবার ধারে বসা মাত্র হেডঅফিস দিল্লি থেকে মেসেজ এল,' বলল মানস। 'কী মেসেজ? না, যে-কোনও মূল্যে দুরন্ত ঈগলকে নিয়ে পাকিস্তানীদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিতে হবে। যেভাবেই হোক বাঁচিয়ে রাখতে হবে চলতি সময়ের সেরা এসপিওনাজ এজেন্ট মাসুদ রানাকে।'

'আচ্ছা! তাতে আপনার মন খারাপ করার কী হলো?' জানতে চাইল রানা, মেসেজটা কীভাবে এল জানার প্রয়োজন বোধ করছে না।

'মন খারাপ করব না? আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আপনাকে সাহায্য করতে হবে, অথচ এখানে ঘটছে ঠিক উল্টোটা– বারবার বিপদে পড়ছি আমি, আপনিই আমাকে সেই বিপদ থেকে বাঁচাচ্ছেন। সত্যি কথা বলতে কী, এজেন্ট হিসেবে আমি আমার সুনাম বজায় রাখতে পারছি না।'

রানা ভাবল, 'তোমার অভিনয় ধরা পড়ে যাচ্ছে, মানস, তুমি সত্যি কথা বলছ না।'

'আপনাকে আরেকটা খবর দিই,' হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল মানস। 'ওরা আমার ভোলাকে পাঠাচ্ছে। ও এলে আমাদের খুব কাজে লাগবে, বুঝলেন না!'

ভ্রূ কোঁচকাল রানা। এই ভোলার কথা আগেও একবার বলেছে মানস। 'আপনার এই ভোলাটা আবার কে?'

'এহ্‌হে, আপনাকে বলিনি বুঝি? ভোলা আমার একমাত্র

ফ্রেন্ড! যদিও আমি দু'পেয়ে আর ও চারপেয়ে, তবু পরস্পরকে আমরা অসম্ভব ভালবাসি ।'

কুকুর? জিজ্ঞেস করতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল রানা। দরদ যেভাবে উথলে উঠছে, কুকুর বললে লোকটা না আবার অভিমান করে বসে।

ওদের পিছনে বাড়ির পরিবেশ ইতিমধ্যে শান্ত হয়ে এসেছে। তারপর হঠাৎ চিনা ভাষায় হইচই করে উঠল একদল লোক।

'দাদা, থান্ডাররা বোধহয় হেরে গেল,' বলল মানস, রানা হাঁটতে শুরু করায় তার পিছু নিয়েছে সে।

'টংরা এখন ডক্টর নাদিরাকে খুঁজবে।' ভদ্রমহিলাকে এক কাঁধ থেকে আরেক কাঁধে নেবার জন্য থামল রানা।

'আমি হয়তো দু'এক মিনিট ওঁকে কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারব,' ব্যাপারটা লক্ষ করে বলল মানস। 'কিন্তু হাঁটতে পারব না। আমার ফিজিকাল কন্ডিশন সেটা অ্যালাও করবে না।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'তার কোনও দরকার নেই। আমার কোনও সমস্যা হচ্ছে না।'

গাছপালার ভিতর দিয়ে যথা সম্ভব দ্রুত এগোচ্ছে ওরা। জঙ্গলের পশুপাখিরা কোনও শব্দ করছে না, শান্তিময় পরিবেশে সগর্জন অনুপ্রবেশ ঘটায় এখনও সন্ত্রস্ত হয়ে আছে ওগুলো। গাছগুলোর মাথা এলোমেলো করে দিচ্ছে সাগরের বাতাস। অবশেষে সরু ট্রেইলে পৌঁছাল ওরা।

হঠাৎ খালি কাঁধে হাতের ছোঁয়া অনুভব করল রানা।

'থামুন,' ওর কানের কাছে ফিসফিস করল মানস। কাঁধটায় আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে মৃদু চাপ দিয়ে নামিয়ে নিল হাত। 'সামনে কেউ আছে। সম্ভবত একজন টং, এই দিকটা পাহারা দিচ্ছে।'

'আমি কোনও শব্দ পাইনি,' বলল রানা। 'আপনার ভুল হচ্ছে না তো?'

মাথা নেড়ে ছাগলদাড়িতে হাত বুলাল মানস। 'আমার ষষ্ঠইন্দ্রিয় কখনও ভুল করে না!' ফিসফিস করল সে। 'এখনই আসছি।'

দ্রুত হারিয়ে গেল ছোটখাট ছায়ামূর্তিটা। পিছিয়ে এসে গাছপালার আড়াল নিল রানা। চোখ বুলাল হাতঘড়ির ডায়ালে।

পশমে ঢাকা ছোট একটা প্রাণী মেটো পথ দিয়ে ছুটে গেল, ধুলোর লম্বা একটা মেঘ তৈরি হতে দেখল রানা। গর্তের ভিতর লুকাল সেটা। একটু দূরে একটা পাখি সুর করে ডেকে উঠল, সাড়া দিয়ে গেয়ে উঠল আরও দু'একটা। ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে উঠছে বনের পশু-পাখি।

ডক্টর নাদিরাকে আবার এক কাঁধ থেকে আরেক কাঁধে নিল রানা। গাছগুলোর মাথার উপর আকাশটা কালো। ডালপালার ফাঁকে আধখানা চাঁদ বেশ উজ্জ্বল।

ঘুমের মধ্যে প্রৌঢ়া বিজ্ঞানী শিউরে উঠলেন একবার। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা লাগছে রানারও। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও। গাছপালার ভিতর দিয়ে বাড়িটার আলো অস্পষ্ট লাগছে। গেছে তো অনেকক্ষণ হলো, মানস ফিরছে না কেন!

হাত ও পা নাড়াচাড়া করে আড়ষ্ট ভাব দূর করছে রানা। ঠাণ্ডাটা বিরক্ত করছে ওকে। শুধু ঢিলে ট্যুরিস্ট শার্ট আর ট্রাউজার পরে আছে ও। ওর কাঁধে নেতিয়ে থাকা ভদ্রমহিলা অস্ফুটকণ্ঠে গুঙিয়ে উঠলেন একবার।

'আমি কোথায়?' বিড়বিড় করলেন তিনি।

কাঁধ থেকে নামিয়ে ওঁকে দাঁড় করাল রানা। 'মাসুদ রানা, ম্যাডাম,' বলল ও। 'ওদের পিছু নিয়ে বাংলাদেশ থেকে এসেছি। আপনি মালয়েশিয়ার কোটা বাহারুতে রয়েছেন।'

মাথাটা ঝাঁকালেন তিনি, যেন পরিষ্কার করতে চাইছেন। তৈরিই ছিল রানা, ভারসাম্য হারাতে যাচ্ছেন দেখে তাড়াতাড়ি ধরে ফেলল।

‘আমার শীত করছে,’ বললেন তিনি, তবে এখনও তাঁকে রানার পুরোপুরি সচেতন বলে মনে হচ্ছে না।

‘যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে আপনাকে সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছি আমরা,’ বলল রানা।

ঝাঁকি দিয়ে মাথা তুললেন তিনি। ‘সন্ত্রাসীরা!’

‘আপতত আপনি নিরাপদ।’ ডক্টর নাদিরার বাহু দুটো একটু ডলে দিল রানা, রক্ত-চলাচল যাতে স্বাভাবিক হয়ে আসে। ‘নড়াচড়া করুন,’ বলল ও। ‘শরীরটা গরম হবে।’

ধীরে ধীরে পা তুললেন ডক্টর নাদিরা, সাবধানে নামালেন, তারপরেই কাত হয়ে পড়ে যাওয়ার উপক্রম করলেন। খপ করে ধরে ফেলল রানা।

আবার ঘড়ি দেখল ও। ভারতীয় এজেন্ট মানস অনেকক্ষণ হলো গেছে, তবে ডক্টর নাদিরাকে ফেলে তাকে খুঁজতে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। ‘আরেকবার চেষ্টা করে দেখবেন হাঁটতে পারেন কি না?’ ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞেস করল রানা।

‘চেষ্টা করতে আমি বাধ্য,’ বললেন ডক্টর নাদিরা। ‘কারণ তুমি যে সেই ঢাকা পর্যন্ত আমাকে কাঁধে করে বয়ে নিতে পারবে, তার নিশ্চয়তা কী?’ আড়চোখে দেখলেন রানাকে।

রানা চুপ করে আছে।

‘শোনো, কাউকে আমি কিচ্ছুটি বলিনি!’ চোখ দুটো কুঁচকে সরু হয়ে গেল ভদ্রমহিলার। ‘যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জিয়া ইন্টারন্যাশনালে পৌঁছে দাও আমাকে, ভাই। দুরন্ত ঈগলে এখনও কিছু কাজ বাকি আছে আমার, বুঝলে!’

‘জী। আসুন।’ ডক্টর নাদিরার হাত ধরল রানা, ট্রেইলের উপর দিয়ে ধীর পায়ে হাঁটিয়ে আনছে তাঁকে।

‘তুমি খুব কম কথা বলছ,’ অভিযোগের সুরে বললেন ডক্টর নাদিরা।

‘আমরা কোনও শব্দ করব না, কেমন?’ নরম সুরে বলল

রানা। 'আশপাশে থাই টং থাকতে পারে।'

'থাই টং? মানে?'

'প্লিজ, ডক্টর। আস্তে।'

'থাই টং আমার কাছে কী চায়?' ট্রেইলের উপর দাঁড়িয়ে পড়লেন বিজ্ঞানী, তাঁর গলা আরও চড়ছে।

জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করল রানা, 'থাই থান্ডার আপনাকে নিয়ে কী করতে চেয়েছিল, জানেন আপনি?'

'ওরা আমাকে কিডন্যাপ করে এনেছে বেইজিং সরকারের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় করার জন্যে,' বললেন ডক্টর নাদিরা।

'এর মধ্যে আরও জটিল অনেক ব্যাপার আছে, সে-সব আপনার না জানলেও চলবে,' বলল রানা। 'শুধু এটুকু জেনে রাখুন, থাই টং আপনাকে একটা পরাশক্তির হাতে তুলে দিতে চায়।'

'আমি যাতে তাদেরকে দুরন্ত বানাতে সাহায্য করি?'

'হ্যাঁ।'

হঠাৎ রানাকে অবাক করে দিয়ে হেসে উঠলেন ডক্টর নাদিরা। হাসির ধরনটা এমনই, বুঝতে অসুবিধে হয় না যে তাঁর একেবারে ভিতর থেকে উঠে আসছে।

'হাসছেন যে?' কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না রানা।

'এখানে ভিলেনের ভূমিকায় কোন্ পরাশক্তি, তা আমি ভাল করেই জানি,' বললেন বিজ্ঞানী। 'খুব ভাল হত যদি ওদের হাতে ধরা পড়তাম আমি!'

'জী?' থতমত খেয়ে গেল রানা। 'ধরা পড়লে ভাল হত? কী বলছেন!'

'ঠিকই বলছি। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না তা হলে কী রকম ঘোল খাইয়ে দিতে পারতাম ওদেরকে!' এখনও হাসছেন ডক্টর নাদিরা।

‘আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না,’ স্বীকার করল রানা। ‘তবে, এ-সব এখন থাক। চলুন, এই জায়গা ছেড়ে কেটে পড়া যাক। আমরা...’

‘না, এক মিনিট থামো,’ বলে হাঁ করলেন ডক্টর নাদিরা। মুখের ভিতর আঙুল ঢুকিয়ে মাড়ী থেকে টান দিয়ে বের করে আনলেন একটা দাঁত। ‘এটার ভেতরে কি আছে জানো? সায়ানাইড। ওদের হাতে ধরা পড়ার পর এটা আমি স্রেফ গিলে ফেলব। ব্যস, ওদের সাধের গুড়ে বালি।’

‘ওহ্ গড!’ আঁতকে উঠল রানা। ‘এ জিনিস কে দিয়েছে আপনাকে?’

‘কেউ না,’ বললেন ডক্টর নাদিরা, রানা বাধা দেওয়ার আগেই দাঁতটাকে আবার মাড়ীতে বসিয়ে ফেললেন। ‘আমি নিজেই রেখেছি ওখানে– প্রয়োজন হলে ওদেরকে যাতে বোকা বানানো যায়।’

‘তাই বলে নিজের জীবন দিয়ে?’ বৃদ্ধাকে অপ্রকৃতিস্থ বলে মনে হচ্ছে রানার।

‘হ্যাঁ,’ হাসিমুখে মাথা ঝাঁকালেন ভদ্রমহিলা। ‘দামটা একটু চড়াই হয়ে যায়।’

হাঁটার গতি মন্থর দেখে তাঁকে ধরে প্রায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে রানা। এগোচ্ছেন তিনি, তবে এখনও এলোমেলোভাবে পা ফেলছেন। মাঝে-মধ্যে অন্ধকারে লুকানো গাছের শিকড়ে পা বেধে যাওয়ায় হোঁচট খাচ্ছেন, তবে রানা ধরে থাকায় আছাড় খাচ্ছেন না।

‘আমার শক্তিতে আর কুলাচ্ছে না!’ বলে হঠাৎ ট্রেইলের উপর বসে পড়লেন ডক্টর নাদিরা।

‘ঠিক আছে।’ ঝুঁকে তাঁকে আবার দু’হাতের মাঝখানে তুলে নিল রানা।

পরমুহূর্তে চেঁচিয়ে উঠলেন ডক্টর নাদিরা।

হাতটা বেরিয়ে এল জঙ্গল থেকে, যেমন ক্ষিপ্র তেমনি লক্ষ্যভেদেও অব্যর্থ, আঘাত করল রানার ঘাড়ের পাশে।

ওর হাঁটু ভাঁজ হয়ে মাটি ছুঁলো, ডক্টর নাদিরার শরীরটা গড়িয়ে সরে গেল দূরে।

পরের আঘাতটা পিছন থেকে লাগল রানার খুলিতে, সম্ভবত রাইফেলের বাঁট দিয়ে মারা হয়েছে।

রানার চেতনা দখল করে নিচ্ছে রাশি রাশি কালো মেঘ। মাথাটা যেন ভেঙে গেছে, ভিতরে প্রচণ্ড ব্যথা। চোখ বুজল ও। জ্ঞান হারিয়েছে।

চার

ঠাণ্ডা পানি দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিচ্ছে কেউ। ভেজা কাপড় খুব নরম লাগছে রানার, আরও নরম হাতটা। যেন ব্যথায় ফুলে উলের একটা বেলুন হয়ে উঠেছে ওর মাথা। তবে কামরাটা বেশ গরম, পানির স্পর্শে আরাম লাগছে। ধীরে ধীরে মাথাব্যথাটা কমে যাচ্ছে।

'হ্যাঁ, ইনিই,' কিশোর যোধনের গলা চিনতে পারল রানা।

চোখ মেলল ও। থাই থান্ডারের সেফ হাউসে, লিভিং রুমে রয়েছে ও। কার্ড টেবিলটা উল্টে পড়ে রয়েছে, অসংখ্য বুলেটে ক্ষতবিক্ষত। মেঝেতে ছড়িয়ে রয়েছে তাস, গড়াগড়ি খাচ্ছে বিয়ারের কয়েকটা বোতল।

এক দুই করে গুনল রানা, ছয়টা লাশ পড়ে রয়েছে কামরার চারদিকে। চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে সবাই তারা থাই, নিশ্চয়ই

থান্ডারের সদস্য; প্রতিটি লাশের পাশে একটা করে একে-ফোরটিসেভেন।

তাদের মধ্যে এক তরুণীও রয়েছে– থান্ডার লিডার চক্রি চুয়ানের বান্ধবী চিত্রলেখা মাহিদল।

লাশগুলোর উপর আরেকবার চোখ বুলাল রানা। এখানে চক্রি চুয়ান নেই।

স্থানীয় কয়েকজন পুলিশ লাশগুলোর চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মেঝে থেকে নিঃশব্দে তুলে নিচ্ছে অস্ত্র আর অন্যান্য এভিডেন্স।

'ইনিই আমাকে পাঠিয়েছিলেন,' আবার বলল যোধন, তার কচি মুখটা টান টান হয়ে আছে, চোখে-মুখে সন্ত্রস্ত ভাব। 'ইনি সুস্থ হয়ে উঠবেন তো?'

'আমি তেরোটা লাশ গুণলাম, সার,' কামরায় ঢোকার সময় এক পুলিশ রিপোর্ট করল। 'তার মধ্যে দুটো ওপরতলায়। একজনকে জীবিত পেয়েছি, তবে তার জখমও সিরিয়াস।'

রানার সামনে বসে থাকা পুলিশ অফিসার গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। 'খানিকটা সুস্থ বোধ করছেন?' রানাকে জিজ্ঞেস করল সে। 'কথা বলতে পারবেন বলে মনে হয়?'

'পারব,' শান্ত গলায় বলল রানা।

ইউনিফর্ম পরা মেয়েটির উদ্দেশে হাত নাড়ল অফিসার, এতক্ষণ যে রানার মুখ মুছিয়ে দিচ্ছিল। 'এখানে তোমার কাজ শেষ, বসুমতি,' বলল সে। 'ওদিকে যাও।'

মাথা ঝাঁকাল সুশ্রী মেয়েটি, তারপর একবারও রানার দিকে না তাকিয়ে পানির পাত্র ও ভেজা কাপড়ের টুকরোটা নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল।

'রাজধানী কুয়ালামালপুর থেকে গোটা বিষয়টা নিয়ে আজই আমাদেরকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে,' রানাকে বলল অফিসার, নিজের চেয়ারে নড়েচড়ে বসল। 'আমরা অন্তত এটুকু

জানি যে বাংলাদেশী এক বিজ্ঞানীকে কিডন্যাপ করে মালয়েশিয়ায় নিয়ে আসা হয়েছে, এবং ব্যাপারটার সঙ্গে থাই ক্রিমিনালদের কয়েকটা সংগঠন জড়িত। তারা যে কোটা বাহারুতে এসে জড়ো হয়েছে, এটা আমাদের কল্পনাতেও ছিল না। এবার আপনি বলুন।'

মাথাটা এখনও ব্যথা করছে রানার, কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। নিজের পরিচয় দিয়ে সংক্ষেপে জানাল কী কারণে কাদের পিছু নিয়েছে ও, কোত্থেকে আসছে, এখানে পৌঁছে কী দেখেছে। মানসের কথাও বলল।

সবশেষে বলল, 'ডক্টর আমার মনোযোগ কেড়ে নেন, সেই সুযোগে সম্ভবত থাই টঙের একজন সেন্ট্রি হামলা চালায়, আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।'

'তা হলে একজন ভারতীয় এজেন্টও নিখোঁজ?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'এখানে আপনাদের খুব বেশি কিছু করার আছে বলে মনে হয় না। ওরা বোধহয় গোপনে সীমান্ত পেরিয়ে থাইল্যান্ডে ফিরে যাচ্ছে। যদি পারেন তো সীমান্তরক্ষীকে সতর্ক করে দিন।'

'ইয়েস, অফিসে পৌঁছে ওটাই আমার প্রথম কাজ হবে,' বলল অফিসার।

'যে লোকটা মারা যায়নি,' বলল রানা। 'আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

ভ্রূ কুঁচকে কী যেন ভাবল অফিসার, তারপর কাঁধ ঝাঁকাল। দোরগোড়ায় দাঁড়ানো কনস্টেবলের দিকে তাকাল সে। 'আহত লোকটা কোথায়? আমাদেরকে তার কাছে নিয়ে চলো।'

অফিসারের সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে দরজার দিকে এগোল রানা, অনুভব করল কে যেন ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। ঘাড় ফিরিয়ে যোধনের দিকে তাকাল ও, হাসল, তার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'দারুণ উপকার করেছ। ধন্যবাদ।'

'আমি দুঃখিত,' হতভম্ব দেখাচ্ছে যোধনকে, কামরার চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে।

'হওয়ারই কথা। কিন্তু কারও কিছু করার ছিল না। তুমি বারান্দায় আমার জন্যে অপেক্ষা করো, ঠিক আছে?' তাকে নিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল রানা। 'শহরে আমরা একসঙ্গে ফিরব, কেমন?'

মুখ তুলে তাকিয়ে হাসল ছেলেটা। মাথা ঝাঁকাল। 'ঠিক আছে।'

কামরায় ফিরে এল রানা, কনস্টেবল হাত তুলে পাশের বেডরুমটা দেখাল ওকে।

বেডরুমে ঢুকে রানা দেখল, মেঝেতে পড়ে থাকা আহত এক লোকের অবস্থা ভাল করে দেখবার জন্য হাঁটু গেড়ে রয়েছে পুলিশ অফিসার, ইউনিফর্মে রক্ত লাগার ভয়ে অত্যন্ত সতর্ক মনে হলো তাকে।

আহত লোকটাকে দেখেই চিনতে পারল রানা। চক্রি চুয়ান, ওরই ব্রাশ ফায়ারে আহত হয়েছে সে।

চক্রি চুয়ান রোগা-পাতলা, চেহারায় শান্ত একটা ভাব, চোখ দুটো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। তার ডান কপালের পাশে একটা লাল জরুল দেখা যাচ্ছে। লোকটার অবস্থা সিরিয়াস বললে কিছুই বলা হয় না, এরকম বীভৎস দৃশ্য সারাজীবনে খুব কমই দেখেছে রানা। তার জখমের সঙ্গে চেহারার শান্ত ভাব একেবারেই খাপ খাচ্ছে না।

কাত হয়ে শুয়ে পেট থেকে বেরিয়ে আসা নিজের সমস্ত নাড়ীভুঁড়ির দিকে তাকিয়ে আছে চক্রি চুয়ান। পিচ্ছিল, টকটকে লাল রক্তের মধ্যে কেউ যেন স্তূপ করে রেখেছে ওগুলোকে।

লোকটার মুখে এমন কোনও রেখা বা ভাঁজ পড়েনি যেটা দেখে বোঝা যাবে ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে সে। গান পাউডারের দাগ ফুটে রয়েছে শরীরের সামনের অংশে। সেলাই করবার প্যাটার্ন

ধরে বুক থেকে নাভি পর্যন্ত ফুটো তৈরি করেছে বুলেটগুলো।

পায়ের শব্দ পেয়ে মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল চক্রি চুয়ান।

‘কী খবর?’

চেহারায় কোনও ভাব নেই, চক্রি চুয়ান এত নিচু গলায় কথা বলল যে কোনও রকমে শুনতে পেল ওরা। ‘যার আয়ু শেষ তার খবর জেনে কী হবে?’

‘মিস্টার রানা,’ পুলিশ অফিসার বলল, ‘আপনি একে চেনেন?’

‘ঢাকা থেকে ওর চেহারার বর্ণনা পেয়েছি,’ বলল রানা। ‘আমার গুলি খেয়েই ওর এই অবস্থা। ভাল কথা, আপনার লোকদের বাড়ির পুব দিকে তল্লাশি চালাতে বলে দিন। এখানে আসার সময় ওদের দুজন সেন্ট্রিকে অজ্ঞান করে রেখে এসেছিলাম। একজনের নাম টাকসিন, তার সঙ্গীর নাম জানি না।’

‘ফিবুন সংগত,’ চিঁ চিঁ করে বলল চক্রি চুয়ান।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা কনস্টেবলের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল অফিসার। তল্লাশি চালাতে চলে গেল লোকটা।

‘তাইম আনন্দ... এবং আর যারা ঢাকায় গিয়েছিল?’ প্রশ্ন করল রানা, বীভৎস দৃশ্যটার দিকে বাধ্য হয়ে তাকিয়ে আছে।

‘পাশের কামরায়,’ বিড়বিড় করল চুয়ান।

‘অন্তত এই কেসে আম আর ছালা, দুটোই হারিয়েছ তোমরা,’ বলল রানা। ‘টং পুরো পেমেন্ট করেনি, বেইজিঙের কাছ থেকেও মুক্তিপণ আদায় করতে পারলে না...’

হাসতে চেষ্টা করে পারল না চুয়ান। ‘তুমি কৌশলে আমার কাছ থেকে তথ্য পাবার চেষ্টা করছ।’ মাথা নাড়ল সে। ‘যদি ভেবে থাকো আমি মারা যাচ্ছি বলে থাই থান্ডার শেষ হয়ে গেল, ভুল করবে।’

‘সব মিলিয়ে এই বাড়িতে তোমাদের লাশ পাওয়া গেছে তেরোটা, তোমাকে বাদ দিয়েই। নেতৃত্ব দেয়ার মত আর থাকল কে!’

‘আমাদের আরও বহু যোগ্য লোক আছে।’

‘আমার ধারণা,’ বলল রানা, ‘তোমার বান্ধবী চিত্রলেখা আমাদের এক এজেন্টকে হোটেল শেরাটনে খুন করেছে আজ।’

‘ঠিক করেছে! আমিই তাকে নির্দেশ দিই!’ বলল চুয়ান। ‘আমাদের এই আস্তানার খোঁজ পেয়ে গিয়েছিল সে।’

‘এই মাত্র দেখলাম পাশের ঘরে মরে পড়ে রয়েছে চিত্রলেখা,’ বলল রানা। ‘প্রকৃতির প্রতিশোধ?’

‘খানিক পরেই আমাদের আত্মা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবে।’

সে থামতেই অফিসার বলল, ‘তুমি যদি মিস্টার রানার সঙ্গে সহযোগিতা করো, তোমাকে আমরা হাসপাতালে পাঠাব।’

‘হুঁহ্, আমাকে যেন মেরামত করা যাবে!’ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল চুয়ান।

‘তুমি জানো,’ জিজ্ঞেস করল রানা, ‘ডক্টর নাদিরাকে কোথায় নিয়ে গেছে থাই টং?’

‘আমাকে দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, মৃত্যুকে আমি ভয় পাই না?’ বলল চুয়ান। ‘জানলেও তোমাকে আমি বলতাম না।’

অফিসারের দিকে তাকাল রানা। ‘ওকে ইন্টারোগেট করার দরকার আছে। বাঁচবে কি না ডাক্তাররাই ভাল বলতে পারবেন, আপনি এখনই একটা অ্যামবুলেন্স ডেকে ওকে হাসাপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন, প্লিজ।’

এই প্রথম চুয়ানের চোখে একটা ভাব দেখতে পেল রানা—ঘৃণা। রানাকে দেখছে সে।

মাথা ঝাঁকাল অফিসার।

‘আরেকটা কথা,’ বলল রানা। ‘শুনলেনই তো যে ওর বান্ধবী

আমাদের এক এজেন্টকে খুন করেছে। আপনি জানেন, লাশটা এয়ারপোর্টে পাঠানো হয়েছে কি না?'

'সত্যি আমি দুঃখিত, এত কম বয়েসে মারা গেলেন তিনি। আমি নিজে ছিলাম লাশের সঙ্গে, মিস্টার রানা,' বলল অফিসার, দাঁড়াল। 'প্লেন টেকঅফ করার পর এয়ারপোর্ট থেকে ফিরেছি।'

তার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল রানা। 'ধন্যবাদ।'

'আমার লোককে বলি, শহরে পৌঁছে দিক আপনাকে, মিস্টার রানা?'

নরম একটা আওয়াজ হলো কামরার ভিতর, যেন বড় করে শ্বাস নিতে চেষ্টা করল কেউ। দুজনেই ওরা ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল।

চোখ খোলা, তবে মণি স্থির হয়ে গেছে চুয়ানের। এক ধরনের স্বস্তি অনুভব করল রানা– যাক, মারা যাওয়ার পর লোকটাকে অন্তত কষ্ট-না-পাওয়ার অভিনয় করতে হচ্ছে না।

'আপনার মাথার অবস্থা বিশেষ ভাল নয়,' করিডর ধরে হাঁটার সময় রানাকে বলল অফিসার। 'ডাক্তারকে একবার দেখানো দরকার।'

'ব্যথাটা কমেছে,' বলল রানা। 'আগে আমাদের বিজ্ঞানীকে খুঁজে বের করি, তারপর ডাক্তারের কাছে যাব।'

'ভুলবেন না। আপনারও কিন্তু বয়স খুব কম।'

পাঁচ

হোটেল তাজমহল। শেষ রাত।

নিজের স্যুইটে ফিরে এসে শাওয়ার সারল রানা, তারপর ক্ষতগুলোর যত্ন নিল। কাপড়চোপড় পরে নিজের সুটকেসটা গুছাল, পাশের স্যুইটে ঢুকল মানসের জিনিস-পত্র নেওয়ার জন্য। দু'হাতে দুটো সুটকেস নিয়ে নীচে নেমে বিল মেটাল দুজনের।

তরুণ ক্লার্ক পেটব্যথার অজুহাতে ডিউটি ছেড়ে চলে গেছে, তার জায়গায় নতুন একটা মেয়ে রয়েছে রিসেপশন কাউন্টারে। রানার ধারণা, মানসের ভুল মৃত্যুসংবাদ দেওয়ার পর ওর মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছে ক্লার্ক, তাই পালিয়েছে।

সুটকেস দুটো নিয়ে তাজের গ্যারেজে চলে এল রানা।

রানার ধারণা, মানসের ষষ্ঠইন্দ্রিয় এতটাই সতর্ক, টং সেন্ট্রির উপস্থিতি আগেভাগে টের পেয়ে তাকে এড়াতে কোনও অসুবিধে হয়নি ওর, ফলে রানার মত আহত হতে হয়নি ওকে। তবে অবশ্য ওদের হাতে ধরা পড়েও থাকতে পারে।

রানার বিশ্বাস, ডক্টর নাদিরার সঙ্গে মানসকেও ধরে নিয়ে গেছে থাই টং। যাই ঘটে থাকুক, তার জিনিস-পত্র নিজের হেফাজতেই রাখবে রানা।

পোর্শ-এর পাশে রেন্ট-আ-কার কোম্পানির একটা মার্সিডিজ রয়েছে, ওটার সামনের সিটে বসে রয়েছে মেয়েটি। রেশমের মত কালো চুল এখন আবার মাথার উপর স্তূপ করা। গায়ের রঙ ঠিক যেন মধু। হলুদ আর নীল ফুলে ভরা স্কার্ট পরেছে, তার উপর কোট।

'মাসুদ রানা।' হাসল উত্তরা উৎকর্ণা।

'হ্যালো, উত্তরা।' পোর্শ-এর পিছনের দরজা খুলে সুটকেস দুটো ভিতরে রাখল রানা, তারপর সামনের দরজা খুলে ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল। আর কিছু না বলে প্যাসেঞ্জার সাইডের দরজাটা খুলল। অপেক্ষা করছে।

মার্সিডিজ থেকে নেমে দরজা বন্ধ করল উত্তরা, লক করল,

তারপর ঘুরে ঢুকে পড়ল পোর্শ-এ। 'ব্যাংকক যাচ্ছ?' ছোট ডাফ্‌ল্ ব্যাগটা কোলের উপর রাখল সে।

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'তুমি জানলে কীভাবে আমি এখানে?'

'বিজনেস সিক্রেট,' বলে হাসল উত্তরা। 'লং ড্রাইভের জন্যে দারুণ একটা রাত, কি বলো? বিশেষ করে আকাশে যখন আধখানা চাঁদ রয়েছে।'

গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে এসে যানবাহনের দ্রুতগতি স্রোতে মিশে গেল পোর্শ। থাই সীমান্তের দিকে যাচ্ছে ওরা। 'সব খবরই রাখো মনে হচ্ছে।'

কথা না বলে মৃদু হাসল উত্তরা।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটাল

'লাবণীকে আমি খুন করিনি,' অবশেষে বলল উত্তরা।

'জানি। করেছে থাই টঙের চিত্রলেখা, নটিকাল স্টোরে ঢুকে যে মেয়েটিকে তুমি ফাঁকি দাও।'

'ও, ওই মেয়েটা! কিন্তু ও কেন আমার পিছু নেবে?'

'ওর বোধহয় ধারণা হয়, তুমি ওকে খুনটা করতে দেখে ফেলেছ, পুলিশকে ওর চেহারার বর্ণনা দিতে পারবে। তোমার উপস্থিতি টের পেয়ে হোটেল থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়, তারপর মেইন রোডে লোকজনের ভিড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তুমি ওকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবার পর তোমার পিছু নেয়। তোমাকে কোথাও একা পাবার আশায় ছিল, যাতে খুন করতে পারে।'

নিজের গলায় একটা হাত তুলল উত্তরা, হঠাৎ করে চুপ হয়ে গেছে। 'ওকে আমি আগে কখনও দেখিনি। কেন পিছু নিয়েছে তা-ও বুঝতে পারিনি।' শ্রাগ করল সে। 'লাবণীর লাশ দেখার পর আমি খুব নার্ভাস ছিলাম।'

'সেজন্যেই বোধহয় আমাকেও তুমি চিনতে পারনি,' বলল রানা। 'নাকি পেরেছিলে?'

'না।'

'তবে বুকস্টোরের মালিক পরে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন,' বলল রানা।

'আমাকে শুধু বললেন তোমাকে খুব সন্দিহান মনে হয়েছে।'

'থাই কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর ফ্রন্ট, ক্যামফ্লাজ আরও নিখুঁত হওয়া উচিত ছিল।'

'দুর্বল একটা দেশে পরাশক্তি ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকলে কত রকমের অসুবিধে দেখা দেয়, বলে বোঝানো কঠিন,' বলল উত্তরা। 'আমাদের ইন্টেলিজেন্স দু'ভাগ হয়ে গেছে; একটা গ্রুপ ওদের পক্ষে, তারাই শক্তিশালী। এ-সব ব্যাপারে তাদের কোনও নজর নেই।' একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল সে। 'যাক গে। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমি খুশি, রানা।'

'খুশি আমিও,' বলল রানা। 'যদিও কিছুক্ষণের জন্যে মনে হয়েছিল তুমিই বোধহয় আমাদের লাবণীকে খুন করেছ।'

'আমরা বান্ধবী ছিলাম, লাবণী আমাকে শাড়ি পরা শিখিয়েছে,' বলল উত্তরা। 'আমাদের রাজপ্রাসাদে বেশ কয়েক রাত কাটিয়েছে ও।'

'আমার জানা ছিল না।'

থাই-মালয়েশিয়া সীমান্ত পশ্চিমদিকে, নদী পেরিয়ে সেদিকে না গিয়ে দক্ষিণে যাচ্ছে রানা। সোজা পথে সীমান্ত না পেরিয়ে একটু ঘুরপথ ধরা উচিত বলে মনে করছে ও।

অন্ধকার গ্রাম্য এলাকার ভিতর দিয়ে দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে পোর্শে, দু'পাশে তারা জ্বলা আকাশে মাথা তুলে আছে নিচু পাহাড়। আধখানা চাঁদ এখন দিগন্তে ঢলে পড়েছে।

'দোই ইনথানন পাহাড়ে তুমি আমাকে বেশ কিছু তথ্য দিয়েছিলে,' বলল রানা। 'সেগুলো আমার কাজে লেগেছে। ধন্যবাদ।'

'তার মানে কি দুর্গে ঢুকেছ তুমি?' প্রায় রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস

করল উত্তরা। 'জেট প্লেনটা তুমিও দেখেছ?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'তেরপল আর ফোমে ঢাকা অবস্থায়,' বলল ও। 'ঢাকায় থাই থান্ডারের যারা অপারেশনে গিয়েছিল, তারা প্রায় সবাই মারা গেছে। ওদের সঙ্গে চিত্রলেখাও।'

'এই পরিচ্ছন্নতা অভিযান আসলে আমাদের চালাবার কথা,' বলল উত্তরা। 'কাজটা আমাদের হয়ে তুমি করে দিচ্ছ, সেজন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'না, আমি একা নই,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'বেশিরভাগই ওরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মরছে।'

'তাই বা মন্দ কী!' হাসল উত্তরা। একটু পর বলল, 'প্লেনটাকে আবার কিন্তু বাইরে বের করে আনা হয়েছে।'

ঝট করে তার দিকে তাকাল রানা। 'মানে? কেন?'

'কারণটা অবভিয়াস নয়?' রানার আশঙ্কাটাই সমর্থন করছে উত্তরা। 'পাখিটাকে নিয়ে উড়াল দেবে ওরা।'

'তুমি তো এখানে, খবরটা পেলে কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল উত্তরা। 'ভুলে গেলে ওখানে আমাদের প্রজারা বাস করে?'

'বাইরে বের করে কোথায় রেখেছে?'

'যেখানে আগে ছিল, লুকানো রানওয়েতে,' বলল উত্তরা। 'অন্তত শেষ খবরে তাই জেনেছি। কৌতূহলী পর্যটক ছাড়াও কিছু লোকজন যাচ্ছে ওদিকের উপত্যকায়, কেউ তারা ফিরছে না। আমার ধারণা, সবাইকে মেরে ফেলা হচ্ছে।'

'এ-সব কি প্রজারা রিপোর্ট করছে তোমাকে?'

'হ্যাঁ,' বলল উত্তরা। 'তবে আমাদের নায়েব কাকা ব্যাপারটা বিশেষ পছন্দ করছেন না। প্রজাদেরকে এ বিষয়ে কৌতূহলী না হতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। বাবার বন্ধু, তাঁর সঙ্গে আমি তর্ক করতে পারি না।'

‘তার মানে আর কোনও খবর আসছে না?’

শ্রাগ করল উত্তরা। ‘তবে সর্বশেষ খবর যেটা পেয়েছি সেটা সত্যিই মারাত্মক।’

উত্তরার দিকে তাকাল রানা। ‘কী রকম?’

‘আবার আগুন লেগেছে পাহাড়ের কয়েক জায়গায়,’ বলল উত্তরা। ‘প্রজারা দেখেছে আগুন লাগার একটু পরেই প্লেনটা থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে শ্বেতাঙ্গ ক্রুরা, অস্থির আর উদভ্রান্ত লাগছিল ওদেরকে।’

‘তার মানে আগুন লাগানোর জন্যে হয়তো ওরাই দায়ী,’ বলল রানা।

‘এর আরেকটা মানে আছে,’ বলল উত্তরা। ‘প্লেনটাকে ওরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। যা করতে চাইছে, উল্টো হয়ে যাচ্ছে।’

‘কেউ মারা গেছে?’ জানতে চাইল রানা।

‘না,’ বলল উত্তরা। ‘প্রথমবার যেখানে আগুনটা লেগেছিল, এবার লেগেছে ঠিক তার উল্টোদিকে। আমার ওই জেটটাকেই দায়ী বলে মনে হচ্ছে।’

‘হুম।’ চিন্তায় পড়ে গেল রানা। ওর অ্যাসাইনমেন্টে দুর্গের ওই জেট প্লেনটার কী যেন একটা গুরুত্ব আছে। তবে সাধারণ একটা জেট প্লেন ওরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না কেন? নাকি ওটা সাধারণ কোনও প্লেন নয়? এখন হয়তো নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না শ্বেতাঙ্গ পাইলট আর ইঞ্জিনিয়াররা, কিন্তু পারতে কতক্ষণ? তখন তো ওটা উড়ে ওর নাগালের বাইরে চলে যাবে।

না, কিছু একটা করা দরকার। এখনই!

থাই-মালয়েশিয়া সীমান্ত এখান থেকে আরও চল্লিশ কিলো পশ্চিমে, ওটার সঙ্গে সমান্তরাল একটা রেখা ধরে একশো কিলোমিটারের বেশি চলে এসেছে পোর্শে।

এখনও বাঁক নেয়নি রানা, সরাসরি সীমান্তের দিকে যাচ্ছে

না। সিদ্ধান্ত নিল, সামনের কোনও শহরে থামবে ও, ফোন করবে বেইজিং-এ। চিনই বর্তমানে দ্বিতীয় পরাশক্তি, দুনিয়ার যে-কোনও জায়গার উপর নজর রাখবার প্রযুক্তি তাদের আছে।

'বলতে পারবে,' উত্তরাকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'বেইজিঙে এখন কটা বাজে?'

'মালয়েশিয়ার সঙ্গে চিনের সময়ের পার্থক্যটা আমার জানা নেই,' বলল উত্তরা। 'তবে আমরা তো থাইল্যান্ডের কাছাকাছি রয়েছি, তাই না? ব্যাংককের ঘড়িতে এখন সকাল সাতটা হলে বেইজিঙের ঘড়িতেও তাই।'

ছোট একটা শহরে ঢোকার মুখেই পাওয়া গেল পে বুদ, সরকারী হাসপাতালের ঠিক পাশেই। চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসের নম্বরে ডায়াল করে নিজের পরিচয় দিল রানা, তারপর সরাসরি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ফুচুংকে চাইল, যদিও জানে ওকে সম্ভবত বলা হবে এত সকালে অফিসে আসেনি সে। সেক্ষেত্রে তার মোবাইল নম্বর চাইতে হবে ওকে।

ঠিক যা ধারণা করেছে রানা। সিএসএস হেডকোয়ার্টার থেকে ওকে বলা হলো, 'অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অফিসে নেই, তবে তিনি বলে গেছেন আপনি খোঁজ করলে আমরা যেন আপনাকে তাঁর মোবাইল নম্বর দিই। লিখে নিন, প্লিজ।'

মোবাইল নম্বরে ডায়াল করল রানা। দু'বার রিঙ হওয়ার পরেই ফুচুঙের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'কী ব্যাপার, দোস্ত? তোর পোর্শ সীমান্ত পেরুচ্ছে না কেন?'

'মানে?' আকাশ থেকেই পড়তে হলো রানাকে। 'আমি কোথায় তুই কীভাবে জানলি?'

অপরপ্রান্তে হাসল ফুচুং। 'আমি যে শুধু তোর কল পাবার অপেক্ষায় আছি, তা নয়, সেই সঙ্গে তোর গতিবিধিও মনিটর করছি। আমার কাছে খবর আছে, ভোর রাতে থাইল্যান্ডের কোনও এক আদিবাসী রাজার মেয়েকে নিয়ে তাজমহল

ছেড়েছিস তুই।'

'মনিটর করছিস?' রানার গলায় সতর্কতা। 'কীভাবে শুনি?'

'নানাভাবে। শুধু একটার কথা বলি, তোর গাড়িতে ব্লিপার আছে।'

'তা-ই বল্!' এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো রানার কাছে। 'তার মানে ওই ব্লিপার আর গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেমের সাহায্য নিয়ে বেইজিঙে বসে দেখতে পাচ্ছিস কোথায় রয়েছে পোর্শ।'

'ঠিক তাই, তবে বেইজিঙে বসে নয়। আমরা এখন অন্য দেশে রয়েছি, সময় হলে জানাব কোথায়। আর, এটা গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম-এর চিনা সংস্করণ।' ফুচুঙের শ্বাস ফেলার আওয়াজ ভেসে এল। 'কী খবর, এবার তাই বল্। আমরা খুব দুশ্চিন্তায় আছি। কোনও কোনও ব্যাপারে কৌতূহলেও।'

'কৌতূহল আবার কী নিয়ে?'

'এই যেমন ভারতীয় সিক্রেট সার্ভিসকে নিয়ে,' বলল ফুচুং।

'ওদের একজন জুটে গেছে আমার সঙ্গে। আচ্ছা, ওদের সম্পর্কে ঠিক কী ভাবছিস তোরা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'জানিসই তো, এশিয়ায় এক-ঘর-মে-দো-পির পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে চলেছে?'

'হ্যাঁ, আজ হোক আর দুদিন পর, ভারতও সুপারপাওয়ার হতে চলেছে,' বন্ধুর কথায় সায় দিল রানা। 'তবে এই কেসটায় ওরা সম্ভবত কারও প্রতিপক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চাইছে না, মনে হয় সাহায্যই করবে। অন্তত আমার তাই ধারণা হয়েছে।'

'আমরাও সেরকম আভাস পাচ্ছি,' বলল ফুচুং। 'সেটা সত্যি হলে ব্যাপারটাকে আমরা অ্যাপ্রিশিয়েট করব।' একটু থেমে যোগ করল, 'এই মেসেজ তুই মিস্টার মানসকে জানিয়ে দিতে পারিস।'

‘তবে সেটা সত্যি না হওয়ারও সমূহ সম্ভাবনা আছে, এরকমও ভাবছিস, নাকি?’

‘ঠিক ধরেছিস,’ হাসল ফুচুং। ‘এবার খবর শোনা।’

‘বেশ,’ বলল রানা। ‘শোন্ তা হলে। এদিকের খবর ভাল নয়।’ সর্বশেষ পরিস্থিতি জানাল রানা বন্ধুকে, তারপর ব্যাখ্যা করে বলল কী চায় ও। বক্তব্য শেষ করল এভাবে, ‘যদি দেখা যায় প্লেনটাকে নিয়ে দুনিয়ার আরেক মাথায় চলে যাচ্ছে ওরা, পারলে আকাশ থেকে ফেলে দিতে হবে ওটাকে।’

এক সেকেন্ড পর ফুচুং জানতে চাইল, ‘আর কী?’

‘আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দরকার, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব,’ বলল রানা।

‘বল্।’

‘তোরা যাদের কাছে ঈগল বিক্রি করেছিস, তাদের প্রত্যেকের বিমানঘাঁটিতে সরেজমিনে তদন্ত করে দেখা দরকার সবগুলোর হিসেব ঠিক আছে কি না, আমি জানতে চাই কোনও প্লেন খোয়া গেছে কি না। সম্ভব?’

‘রানা, তোর প্রশ্নের জবাব এখনই জেনে নে,’ বলল ফুচুং। ‘আমদের নিজেদের একটা কমিটি সরেজমিনে তদন্ত করে দেখে এসে রিপোর্ট করেছে। আমরা যে-সব দেশকে যে-কটা ঈগল বিক্রি করেছিলাম সবগুলোরই হিসাব পাওয়া গেছে, শুধু একটি দেশের একটি ঈগলকে আমাদের সদস্যদের দেখার সুযোগ হয়নি।’

‘কেন?’ জানতে চাইল রানা।

‘ওরা বলছে, ওই ঈগলটায় যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়ায় একটা হ্যাঙ্গারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মেরামত করার জন্যে। হ্যাঙ্গারটা ওদের কোনও গোপন ঘাঁটিতে, তাই আমাদেরকে নিয়ে যেতে রাজি হয়নি ওখানে, আমরাও জোর-জবরদস্তি করতে পারিনি।’

হতাশ বোধ করল রানা। সন্দেহ নিরসন হচ্ছে না। 'দেশটার নাম জানতে পারি?'

'হয়তো পরে কোনও দিন,' জানাল ফুচুং।

'ওরা যদি সত্যি কথা বলে তা হলে দোই ইনথাননে ওটা কী?' রানা বিমূঢ়। 'কোত্থেকে এল?'

'দোস্ত,' ধীরে ধীরে বলল ফুচুং, 'প্রশ্নটার জবাব তোর কাছ থেকে পাব বলে আশা করছি আমি।' একটু থেমে আবার বলল, 'আমরা সবাই।'

'হুম।'

'আর কিছু?' জিজ্ঞেস করল চিনা সিক্রেট সার্ভিসের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর।

'আপাতত আর কিছু নয়।'

'যে সাহায্যই লাগুক, সবরকম প্রস্তুতি নিয়ে তোর খুব কাছাকাছি তৈরি হয়ে আছি আমরা,' বলল ফুচুং। 'চাওয়া মাত্রই পাবি। শর্ত একটাই, দোস্ত, আমার মুখ যেন রক্ষা হয়। তোকে নিয়ে আমাদের ওপর মহলে এত বোলচাল মেরেছি...'

'জানি,' বলল রানা, 'তোর যা স্বভাব!'

'তারপরও বলছি– ডক্টর নাদিরাকে আমরা ফেরত চাই,' বলল ফুচুং। 'আমরা মানে, ঢাকা এবং বেইজিং। একটা কোড দিচ্ছি, মুখস্থ করে রাখ্।' কোডটা বলবার পর রানাকে দিয়ে উচ্চারণ করাল সে, তারপর বলল, 'আপাতত বিদায়, দোস্ত।'

'আপাতত।'

ছয়

গাড়িতে ফিরে এসে রানা বলল, ‘তুমি বলছিলে পাহাড়ে নতুন করে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে।’

‘ভাগ্যই বলতে হবে, ওই আগুনে নতুন করে বানানো কুঁড়েগুলোর কোনও ক্ষতি হয়নি।’ মুখের সামনে হাত রেখে হাই তুলল উত্তরা। ‘খুব ক্লান্তি লাগছে। মনে করতে পারছি না শেষ কখন ঘুমিয়েছি।’ সিটে হেলান দিল সে।

‘আমারও একই অবস্থা। ব্যাংককে ফিরি, হোটেলে উঠে লম্বা ঘুম দেব।’

মাথাটা রানার কাঁধে ঠেকাল উত্তরা। ‘একা?’

মৃদু হাসল রানা। ‘না, পাশে রাজকন্যেকে নিয়ে।’

চোখ বুজল উত্তরা। ‘তবে,’ ঘুম জড়ানো গলায় বলল, ‘ব্যাংককে নয়।’

‘মানে?’ ভ্রূ উঁচু করল রানা। ‘ব্যাংককে নয়তো কোথায়?’

প্রশ্নটার কোনও উত্তর পাওয়া গেল না, কারণ এরইমধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে উত্তরা।

নির্জন হাইওয়ে ধরে তীরবেগে গাড়ি চালাচ্ছে রানা। পুবের আকাশ প্রথমে ফরসা হলো, তারপর রাঙা। নদীটাকে অনেক আগেই পিছনে ফেলে এসেছে ওরা। এখনও দক্ষিণে ছুটছে

পোর্শ।

ওর কাঁধে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে উত্তরা, ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করে কী সব বলছে। একবার বলল, 'সত্যশুভ চুনাভান, সার!'

মেয়েটার গায়ের সেন্টে ভরে আছে গাড়ির বাতাস, নতুন ওঠা সূর্য আর ঘাসের ডগায় লেগে থাকা শিশিরবিন্দু তাতে আশ্চর্য একটা মাদকতা এনে দিয়েছে।

ঘুম ভাঙার পর বিড়ালের মত আড়মোড়া ভাঙল উত্তরা। 'স্বপ্ন দেখছিলাম,' বলে অলস একটু হাসল। 'তোমাকে।'

'কী করছিলাম আমরা?'

উত্তরার ঠোঁটে রহস্যময় হাসি। 'এতই যখন আগ্রহ, গাড়িটা আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে মহাশয় একটু ঘুমিয়ে নিন, ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখুন– ব্যস, তা হলেই জেনে যাবেন কী করছিলাম।'

'আমাকে নিজে দেখে নিতে হবে? এমন কাজই করছিলাম, মুখে আনতে পারছ না?'

রানার কাঁধে হালকা একটা ঘুসি মারল উত্তরা।

'লাবণী সম্পর্কে এখনও কিছু বলোনি তুমি আমাকে,' মনে করিয়ে দেওয়ার সুরে বলল রানা। 'থাইল্যান্ড থেকে কোটা বাহারুতে এসে খুব ব্যস্ত ছিল ও, হোটেলে নাম লিখিয়েই কোথায় যেন চলে গিয়েছিল।'

'গিয়েছিল আমার কাছে,' বলল উত্তরা। 'তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছিলাম না, তাই ভাবলাম লাবণীর মাধ্যমে কিছু তথ্য দিই। শুনে আমার হোটেলে চলে আসে ও।'

'কিন্তু পরে তুমিও তার হোটেলে যাও। গিয়ে দেখো চেয়ারে তার লাশ। কেন?'

'লাবণী তার পার্সটা আমার হোটেল রুমে ফেলে গিয়েছিল,' বলল উত্তরা। 'ও বেরিয়ে যাবার সাত থেকে দশ মিনিটের মধ্যে আমার চোখে পড়ে ওটা। ভেতরে প্রচুর টাকা, একটা নোটবুক, এই সব ছিল। কাজেই তাড়াতাড়ি একটা ট্যাক্সি নিয়ে শেরাটনে

চলে যাই। গিয়ে দেখি...' নিঃশব্দে কেঁদে ফেলল সে।

পকেট থেকে রুমাল বের করে ওর হাতে ধরিয়ে দিল রানা। উত্তরা চোখ মুছল। 'কী তথ্য, উত্তরা?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করল ও।

নিজেকে সামলে নিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল উত্তরা। কচি রোদ লেগে ঝলমল করছে ঢেউ খেলানো ধানখেত, মাইলের পর মাইল। এরই মধ্যে দু'একজন কৃষক গরু ও লাঙল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে খেতের কাজে।

'আমরা ব্যাংককে যাচ্ছি না, রানা,' বলল উত্তরা। 'যাচ্ছি চিয়াং মাই-এ।'

রানা ভাবছে– চিয়াং মাই বেশ বড় শহর, ব্যাংকক থেকে প্রায় ছয়শো কিলোমিটার দূরে। 'কেন।'

'চিয়াং মাই থেকে দোই ইনথানন আর টং দুর্গ একদম কাছে, মাত্র কয়েক কিলোমিটার...'

'তা জানি।'

'মোহনা কৃত্তিকাচরণের কথা মনে আছে তোমার?' জিজ্ঞেস করল উত্তরা। 'রানা এজেন্সির শাখাপ্রধান ইমরুল কায়েসের সঙ্গে যার বিয়ে হবার কথা ছিল?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'কেন মনে থাকবে না!' এক ধরনের তৃপ্তি অনুভব করল ও, মনে মনে ছেলেটার উদ্দেশে বলল– তোমার খুনিকে আমরা ছাড়িনি, ইমরুল!

'আমাদের অপারেশন্স চিফ, সত্যশুভ চুনাভান, ওখানে ডিউটিতে পাঠিয়েছে মোহনাকে। ওখানে মানে... ওখানকার একটা ব্রথেল-এ।'

'কেন, কী আছে ওখানে?'

'ওটা খুব নামকরা ব্রথেল,' বলল উত্তরা। 'শুধু গডফাদাররা আসা-যাওয়া করে। আর যায় বিদেশিরা। কারা, আশা করি বুঝতেই পারছ– যে-সব বিদেশি কাছাকাছি আছে। তারা খদ্দের

হিসেবে ওখানে যায়, আর বকবক করে। সে-সব রেকর্ড করা হয়। ওগুলোয় গুরুত্বপূর্ণ কোনও তথ্য থাকলে সত্যশুভ চুনাভানকে রিপোর্ট করা হয়।' বড় করে একটা দম নিল সে। 'মোহনা ওখানে তোমাকে ডেকেছে।'

'কেন?' রানার কণ্ঠস্বরে একটু যেন সন্দেহ। নাকি দ্বিধা?

'কেন, সেটা ওখানে গিয়ে তার মুখ থেকে শুনতে হবে,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল উত্তরা। 'এই মেসেজটাই তোমার কাছে পৌঁছানোর জন্যে লাবণীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম আমি। এখন তুমি যাবে কি না, সেটা তোমার ব্যাপার।'

'ঠিক আছে, সীমান্ত পেরিয়ে থাইল্যান্ডে আগে ঢুকি, তারপর সিদ্ধান্ত নেব,' বলল রানা। 'মোহনা হয়তো এমন কিছু জানে, যা আমাদের নিখোঁজ বিজ্ঞানীর হদিস পেতে সাহায্যে আসবে।'

'তিনি এখন থাই টঙের হাতে,' বলল উত্তরা।

রানা চিন্তিত। 'উপত্যকার ওই জেট আর ডক্টর নাদিরার মধ্যে কী যেন একটা কানেকশন আছে।'

'কেন তোমার এ-কথা মনে হচ্ছে?'

'তোমাদের পাহাড়ে ওই রহস্যময় আগুন লাগছে দেখে। ওগুলোর জন্যে দায়ী লেযার,' বলল রানা। 'ডক্টর নাদিরা লেযার সম্পর্কে একজন এক্সপার্ট।'

পরিষ্কার আকাশ। সীমান্তের দিকে বাঁক নেওয়ার পর থেকে সূর্য ওদের পিছনে। মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে ঝাঁক ঝাঁক পাখি। হাইওয়েতে এখন তরি-তরকারি আর মাংস ঠাসা ট্রাক দেখা যাচ্ছে প্রায়ই।

ক্যামপং লালুক শহরটাকে পাশ কাটিয়ে এসে হঠাৎ করে দ্রুত হুইল ঘোরাল রানা, হাইওয়ে ছেড়ে সরু একটা সাইড রোডে ঢুকে পড়ল পোর্শে।

তাড়াতাড়ি ড্যাশবোর্ড আঁকড়ে ধরল উত্তরা, জানালা দিয়ে

তাকাতে একটা রোড সাইন দেখতে পেল: ক্যামপং কোচি—দশ কিলোমিটার।

'সামনে সীমান্ত,' বলল রানা। 'আমার কাছে নানা ধরনের কাগজ-পত্র আছে, তবে কোনও মেয়ের কাজে লাগবে না। তোমার কী অবস্থা?'

দাঁত দিয়ে ঠোঁটের কোণ কামড়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল উত্তরা।

'ঠিক যা ভেবেছি,' হাসিমুখে বলল রানা। 'পাহাড়ী ট্রেইল ধরে সীমান্ত পেরুতে অভ্যস্ত তুমি।' উত্তরার হাঁটুতে মৃদু চাপড় মারল ও।

উঁচু-নিচু ট্রেইল ধরে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট সাবধানে গাড়ি চালাল রানা। ধুলোময় গ্রাম্য পথে গরুর গাড়ি চলছে, পাশের খেতে লাঙল দিচ্ছে চাষী, আড়াআড়িভাবে হেলেদুলে রাস্তা পেরুচ্ছে হাঁসের ঝাঁক, মাথায় খাবারের পোঁটলা নিয়ে আল ধরে হাঁটছে চাষীবউ; এ-সবের মাঝখানে ঝলমলে পোর্শটা একেবারেই বেমানান, যেন ভিনগ্রহের ইউএফও।

ধুলোর ধূসর একটা মেঘ, দিগন্তকে ঢেকে দিচ্ছে, উত্তরার আগে রানাই প্রথম দেখতে পেল। এখন ওরা থাইল্যান্ডে। এখান থেকে হাইওয়ে পনের মিনিটের পথ। তবে হাইওয়ের নিরাপত্তা আর ওদের মাঝখানে ছোট একটা ভেহিকেল দেখা যাচ্ছে।

'মোটরসাইকেল,' অবশেষে আন্দাজ করতে পারল রানা।

দ্রুত মুখ তুলল উত্তরা। রানার হাত থেকে বিনকিউলারটা নিয়ে চোখে তুলল। 'সর্বনাশ, লক্ষণ ভাল নয়!' নার্ভাস হয়ে পড়ল ও, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুতে চাইছে না। 'এখানে থাই ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ কেন?'

'থাই ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ?' রানার গলায় সন্দেহ।

'আমি শিওর।'

'এত দূর থেকেও চিনতে পারছ? কীভাবে?'

'চিনছি ব্রাউন সাফারি সুট আর মোটরসাইকেল দেখে,' বলল উত্তরা। 'থাই ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ-এর ড্রেস ওটা।'

'তার মানে তোমার পরিচিত,' বলল রানা। 'লক্ষণ ভাল নয় বলছ কেন?'

'না, পরস্পরকে আমরা চিনব না। এরা শুধু দেশের ভেতরে, বিশেষ করে সীমান্ত এলাকায় ডিউটি দেয়।'

'আচ্ছা, হুম।'

'কী করব আমরা? আমাকে বোধহয় তোমার নামিয়ে দেয়া উচিত...'

'সমস্যা এখন শুধু তোমাকে নিয়ে নয়,' বলল রানা। 'পোর্শও একটা সমস্যা। মরুভূমিতে নিঃসঙ্গ কৃষ্ণচূড়ার মত, সবার চোখেই ধাক্কা মারছে।'

'কিন্তু একা একজন আই.বি এজেন্ট কী করছে এখানে?' মাথা নাড়ল উত্তরা, ব্যাপারটা মেলাতে পারছে না। 'ওকে পাঠানো হয়েছে বিশেষ করে এই রাস্তা পাহারা দেয়ার জন্যে। আমার সন্দেহ হচ্ছে, তোমার খোঁজে সীমান্তের সবগুলো পথে লোক পাঠানো হয়েছে, এ তাদেরই একজন।'

'প্রথমে তো শোনা গেছে তোমাদের কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স বিদেশি এক শক্তির ভয়ে অসহায় বোধ করছে, এখন দেখছি আই.বি ওদের হয়ে একেবারে মাঠে নেমে পড়েছে! সেটা কীভাবে সম্ভব?'

'আমাদের সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে অনেক আগেই দু'টো ভাগ হয়ে গেছে, রানা,' বলল উত্তরা। 'নানান রকম সুযোগ-সুবিধে পাবার জন্যে একটা অংশ আমেরিকার কথায় ওঠে-বসে।'

দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। ধূসর মেঘ ছড়িয়ে পড়ছে মাঠ থেকে মাঠে, ছোট্ট বিন্দুটা পরিণত হচ্ছে সগর্জন মোটরসাইকেলে।

রাস্তার পাশে সরিয়ে এনে গাড়িটাকে দাঁড় করাল রানা। নীচে নেমে ফ্রন্ট টায়ারের একটা ভালভ-এ চাপ দিল। হিস্‌হিস্‌ করে বাতাস বেরিয়ে যাওয়ায় চ্যাপ্টা হয়ে গেল সেটা।

ছোট ডাফ্‌ল্‌ ব্যাগটা হাতে নিয়ে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল উত্তরা। ট্রাঙ্ক থেকে জ্যাক আর টায়ার আয়রন বের করল রানা।

গাড়ি ও রানার দিকে পিছন ফিরে হাঁটা ধরল উত্তরা, ঝাঁকড়া মাথা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটা গাছের দিকে যাচ্ছে।

তুমুল বেগে ছুটে আসছে মোটরসাইকেল। সেদিকে যেন কোনও খেয়াল নেই, এরকম একটা ভাব ধরে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে রইল রানা। কার ফ্রেমের নীচে জ্যাকটা ঢোকানো হয়ে গেছে ওর।

বিরাট মোটরসাইকেলটা থামল। হেলমেট পরা দীর্ঘদেহী ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ এজেন্ট রানার উপর চোখ রেখে নীচে নামল। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে সে। বোতাম খোলা জ্যাকেটের ভিতর হোলস্টার দেখা যাচ্ছে, সেটা থেকে উঁকি দিচ্ছে ল্যুগারের চকচকে বাঁট।

মাথা তুলে তাকাল রানা, নিঃশব্দে হাসল, জ্যাক পাম্প করছে। 'হ্যালো!' বলল ও, তারপর হাতটা মুছে নিয়ে বাড়িয়ে ধরল। 'ঠিক আমাদের দেশের মতই। প্রয়োজনের সময় সার্ভিস স্টেশন পাবেন না।'

'কী?' থাই ভাষায় জিজ্ঞেস করল ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের এজেন্ট, মারমুখো একটা ভাব নিয়ে আছে সে, চোখে-মুখে রাজ্যের সন্দেহ। রানার বাড়ানো হাতটা গ্রাহ্যই করছে না।

ড্যাশবোর্ড থেকে থাইল্যান্ড ভ্রমণের কাগজ-পত্র আর পাসপোর্ট বের করল রানা, সেগুলোয় ওর নাম মাসুদ রানা দেখানো হয়নি। অধৈর্য একটা ভাব নিয়ে চারদিকে তাকাচ্ছে আই.বি এজেন্ট।

'দুঃখিত, সার,' ভাঙা ভাঙা থাই ভাষায় শুরু করল রানা,

কাগজগুলো ধরিয়ে দিল তার হাতে। 'আমি আসলে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে বেরিয়েছিলাম। কিন্তু কখন জানি না হারিয়ে গেছি।' হাত তুলে ঢেউ খেলানো গ্রাম্য এলাকাটা দেখাল।

জাল কাগজগুলো পড়ছে আই.বি এজেন্ট। তার মারমুখো ভাব আরও গভীর হলো চেহারায়।

'হাইওয়ে কি এখান থেকে অনেক দূরে?' জিজ্ঞেস করল রানা, আবার পাম্প শুরু করল।

'মহিলাটা কোথায়?' কাগজ থেকে মুখ তুলে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল আই.বি এজেন্ট, গাছগুলোর ওদিকে তল্লাশি চালাচ্ছে তার চোখ। কাগজগুলো তালুর উপর ভাঁজ করছে সে।

'টয়লেটে,' বলল রানা, টায়ার ঘুরিয়ে লিক খুঁজছে। 'আমার স্ত্রীকে খুব বেশি টয়লেটে যেতে হয়।' হেসে উঠল ও।

আই.বি এজেন্ট হাসল না। 'আপনার কাগজ-পত্র সব ঠিক আছে বলে মনে হলো,' বলল সে, গাছগুলোর দিক থেকে চোখ সরাচ্ছে না। 'আপনার স্ত্রীর কাগজ কার কাছে?'

গাছপালার আড়াল থেকে ধীর, সাবধানী পায়ে বেরিয়ে আসছে উত্তরা। পেটটা ফুলে গোল একটা ঢোল হয়ে আছে, কারণ ভারী কোটের নীচে ডাফ্‌ল্ ব্যাগটা গুঁজে রেখেছে সে। কপালে উঠে গেল একটা হাত।

লাফ দিয়ে সিধে হলো রানা, দ্রুত পায়ে ছুটে গিয়ে তার হাত ধরে ফেলল।

তাকিয়ে আছে আই.বি এজেন্ট, মারমুখো ভাবটা দূর হয়ে গেছে চেহারা থেকে, চোখের তারায় একটু যেন কৌতুকের ঝিলিক।

দুনিয়ার সব কালচারেই দেখা যায় অন্তঃসত্ত্বা মেয়েদের ইন্টারেস্টিং সব পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া থাকে। মাথাটা রানার কাঁধে রাখল উত্তরা।

'কেমন করছি আমি?' ফিসফিস করে জানতে চাইল সে।

‘ভান করো তুমি অসুস্থ,’ শান্ত সুরে বলল রানা।

হঠাৎ কুঁজো হলো উত্তরা, পেট ফুলিয়ে রাখা ডাফ্‌ল্‌ ব্যাগের উপর চেপে বসল তার হাত দুটো। গোঙাচ্ছে।

তাড়াতাড়ি তাকে দু’হাতের উপর তুলে নিল রানা, পোর্শ-এর দিকে হেঁটে যাওয়ার সময় চেহারায় উদ্বেগের ছাপ ফুটে উঠল।

তরুণ আই.বি এজেন্ট দ্রুত ওদের দিকে এগিয়ে আসছে।

‘গাড়ি!’ গলা চড়িয়ে বলল রানা। ‘দরজাটা খুলুন!’

ঘুরে গাড়ির দিকে লাফ দিল লোকটা, টান দিয়ে খুলে ফেলল পোর্শ-এর দরজা। তার ভ্রূ দুশ্চিন্তায় কুঁচকে আছে। সন্তানপ্রসব তার ট্রেনিঙের সূচিতে ছিল না।

উত্তরাকে সিটে শুইয়ে দিল রানা। মাথাটা এদিক ওদিক দোলাচ্ছে সে, চোখ দুটো বন্ধ।

‘টায়ারটা তো না বদলালেই নয়,’ বিড়বিড় করে নিজের কাজে ফিরে যাচ্ছে রানা।

আই.বি এজেন্ট সাহায্য করায় চ্যাপ্টা টায়ার খুলে ট্রাঙ্ক থেকে স্পেয়ারটা নিয়ে এসে দ্রুত ফিট করল রানা। যন্ত্রপাতিগুলো ট্রাঙ্কে রেখে দিচ্ছে ও, একটা ক্যানটিন আনবার জন্য মোটরসাইকেলের দিকে এগোল লোকটা।

ফিরে এসে উত্তরার দিকে পোর্শ-এর দরজা খুলল আই.বি এজেন্ট, পানি ভর্তি ক্যানটিনটা বাড়িয়ে ধরল তার দিকে।

নিজের সিটে উঠে বসল রানা, স্টার্ট দিল পোর্শ-এর মোটরে। ‘ধন্যবাদ, ব্রাদার,’ বলল ও, দেখল ক্যানটিনে আরেকটা চুমুক দিচ্ছে উত্তরা।

আই.বি এজেন্টের ঠিক আধ সেকেন্ড আগে ব্যাপারটা খেয়াল করল রানা। উত্তরার কোটের কিনারা ছাড়িয়ে নীচে বেরিয়ে পড়েছে ডাফ্‌ল্‌ ব্যাগ। ব্যাপারটার তাৎপর্য বুঝতে মাত্র এক সেকেন্ড সময় নিল বুদ্ধিমান এজেন্ট।

পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল রানা।

এক হাতে হ্যাঁচকা টান দিয়ে উত্তরার কোটের বোতাম ছিঁড়ে ফেলল আই.বি এজেন্ট, আরেক হাত দিয়ে শোলডার হোলস্টার থেকে টেনে নিল পিস্তলটা।

সময়ের ক্ষুদ্র একটি ভগ্নাংশ, সেটাকেই মনে হলো যেন অনন্তকাল। দুর্ধর্ষ বিসিআই এজেন্ট ও থাই ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের এজেন্ট পরস্পরের চোখের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকল।

দুজনেই জানে, যে মন্থর, এরইমধ্যে মারা গেছে সে।

পরমুহূর্তে একটাই গুলির আওয়াজ হলো গাড়ির ভিতর। কটুগন্ধী ধোঁয়ায় ভরে উঠল বাতাস। বুলেটের ধাক্কায় ছিটকে গাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল থাই আই.বি এজেন্ট, রাস্তার ধারে হাত-পা মেলে চিত হয়ে পড়ল। তার বুকটা তরমুজের মত ফেটে গেছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে রাস্তার পাশের মাটি, ফুটো হওয়া হৃৎপিণ্ড শেষ বারকয়েক পাম্প করছে, নিস্তেজ হয়ে আসছে রক্তের ফোয়ারা।

নিজের কবজিটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছে উত্তরা।

'ওদিকের দরজা বন্ধ করো!' বলল রানা, গাড়ি থেকে নেমে যাচ্ছে।

নির্দেশ পালন করল উত্তরা।

রাস্তার দুদিক দেখে নিল রানা, যতদূর দৃষ্টি যায় ফাঁকা পড়ে আছে। লাশটা ভাল করে সার্চ করল ও। কাগজ-পত্র যা পেল সব ভাল করে পড়ল। উত্তরার কথাই ঠিক, লোকটা থাই ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের একজন এজেন্টই ছিল। রাস্তা থেকে তার পিস্তলটা কুড়িয়ে নিয়ে কোমরে গুঁজে রাখল ও।

ফিরে এসে গাড়ি ছেড়ে দিল রানা। থমথম করছে চোখ-মুখ। কয়েক মিনিট পর হাইওয়েতে উঠে এল পোর্শ।

সাত

যুদ্ধে দু'একটা প্রতিপক্ষ বদলে গেছে, কাজেই রানার রণকৌশলেও পবিবর্তন আনা দরকার। ওর ধারণা, থাই থান্ডারের যে ক্ষতি হয়ে গেছে, সেটা কাটিয়ে উঠে আবার মাঠে নামতে প্রচুর সময় লাগবে ওদের।

এখন নতুন এক প্রতিপক্ষ, থাইল্যান্ডের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের একটা সেকশনের সঙ্গে লড়তে হবে ওকে। তবে থাই টং-ই এখনও ওর প্রধান শত্রু, যাদের হাতে বিজ্ঞানী ডক্টর নাদিরা বন্দি।

রানা সিদ্ধান্ত নিল, কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স এবং আই.বি-র কোন্ গ্রুপ কখন কী করছে ওর জানা দরকার। আর তা জানবার সহজ উপায় হলো উত্তরাকে সঙ্গে নিয়ে মোহনার ডাকে সাড়া দেওয়া।

গাড়ির ভিতর পরিবেশটা বেশ কিছুক্ষণ নীরব আর বিষণ্ণ হয়ে থাকল। হোক না ভিন্ন ডিপার্টমেন্টের, উত্তরার দেশের একজন এজেন্টকে ওরই চোখের সামনে খুন করেছে রানা। তাতে অবশ্য উত্তরার নৈতিক সমর্থনও আছে, কারণ একা শুধু রানা বিপদে পড়তে যাচ্ছিল না। তারপরেও এক ধরনের হতোদ্যম ম্লান করে রাখল ওকে।

তবে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিচ্ছে ওরা, একসময় আবার সহজ হয়ে

উঠল পরিবেশটা।

থাই-মালয়েশিয়া সীমান্ত থেকে দীর্ঘ পনের শো কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে চিয়াং মাই শহরে পৌঁছাতে বিকেল হয়ে গেল ওদের।

ব্যাংকককে পাশ কাটিয়ে এসেছে ওরা, যেখানে পেরেছে হাইওয়ে কিংবা মেইন রোড ব্যবহার করেনি। উত্তরাও তাই চেয়েছে, কারণ সে-ও ভয় পাচ্ছে আই.বি অফিসারের লাশ আবিষ্কারের পর খুনির খোঁজে শুধু আই.বি নয়, পুরো শক্তি নিয়ে গোটা পুলিশ বিভাগকেও মাঠে নামানো হবে।

শহরে ঢোকার আগে একটা থিয়েটারের লেডিস ও জেন্টস রুমে ঢুকে নিজেদের চেহারা যতটা সম্ভব বদলে নিতে ভোলেনি ওরা।

এতটা পথ পাড়ি দিয়ে আসায় দুজনের কেউই তেমন ক্লান্ত নয়। কারণ, রাত জাগলেও, সারাটা দিন পালা করে ঘুমিয়ে নিয়েছে ওরা।

হোটেল ময়ূরী ইন্টারন্যাশনালে নাম লেখাচ্ছে রানা, 'আসছি' বলে কোথাও গেছে উত্তরা, সম্ভবত মোহনার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে, কিংবা নিজেদের হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট করতে।

রিসেপশনে দুজনের ব্যাগ রেখে লবির বাইরে বেরুল রানা, বড় একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ঢুকে উত্তরার জন্য কিছু কেনাকাটা করল– ম্যাচ করা ব্লাউজ-পেটিকোট ইত্যাদি সহ হালকা সবুজ রঙের সিল্ক শাড়ি; পরচুলা, পারফিউম ও একটা মেকআপ বক্স। আরও একটা জিনিস কিনেছে, তবে বাক্সটা দেখে বোঝবার কোনও উপায় নেই ভিতরে কী আছে।

নিজের জন্যেও দু'একটা জিনিস কিনল রানা। আবার লবিতে ঢোকার আগে কিছু গোলাপ নিতেও ভুলল না।

রিসেপশনে ফিরে ব্যাগ দুটো নিল রানা, এলিভেটরে চড়ে

উঠে এল ছয় তলায়। স্যুইটের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল। জানালার সাদা সিল্ক পরদার প্রান্ত বাতাসে উড়ে চলে এসেছে ডাবল বেডের উপর।

বেডের পাশে কার্পেটে নিজের সুটকেস রাখল রানা, ওটার পাশে উত্তরার কাপড়ের তৈরি ডাফ্‌ল্‌ ব্যাগটা।

মুহূর্তের জন্য মোটরসাইকেল আরোহী আই.বি এজেন্টের কথা মনে পড়ে গেল রানার। তার লাশটা এতক্ষণে কারও চোখে না পড়বার কোনও কারণ নেই। অথচ যতক্ষণ হাইওয়ে আর মেইন রোডে ছিল ওরা, কিংবা শহরে ঢোকার পরেও, একবারও মনে হয়নি ওদেরকে কেউ খুঁজছে।

হয়তো ভাগ্যই সহায়তা করছে ওদেরকে, কেউ দেখেনি পোর্শ-এর পাশে মোটরসাইকেল থামিয়েছিল লোকটা। তাকে না মেরে কোনও উপায় ছিল না রানার, তবে প্রতিবারের মত কষ্টও পাচ্ছে। লোকটা খুন না হলেও পারত।

প্যাকেট খুলে উত্তরার সমস্ত কাপড়চোপড় আর আনুষঙ্গিক জিনিস বিছানায় সাজিয়ে রাখল রানা। শুধু বিশেষ বাক্সটা খুলল না, যত্ন করে রাখল নিচু টেবিলটার উপরে।

বাথরুমে ঢুকে শাওয়ার সেরে দাড়ি কামাল ও, যত্ন নিল ক্ষতগুলোর। একটু পরেই চলে আসবে উত্তরা।

নিজেকে এতক্ষণে স্মরণ করবার অনুমতি দিল রানা– দোই ইনথানন পাহাড়ের সেই মায়াবী রাতে, ওদের কোনও এক প্রজার গোয়ালঘরে, কী প্রচণ্ড উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠেছিল সে; কী নরম আর পেলব তার শরীর; কী আশ্চর্য ব্যগ্র-ব্যাকুলতা নিয়ে রানার হাতে তুলে দিয়েছিল নিজেকে।

স্লিপিংগাউন পরে বেডরুমে ফিরে বিছানায় উঠে পড়ল রানা, প্রিয় অস্ত্র ওয়ালথারটা রাখল বালিশের নীচে। দরজায় তালা দেওয়া, কামরার বাতাস না ঠাণ্ডা না গরম।

অপেক্ষা করছে, ক্লান্তিতে ওর চোখে ঘুম চলে এল।

স্যুইটের তালায় চাবি ঢোকানোর আওয়াজ হতে ঘুম ভেঙে গেল রানার। বালিশের তলা থেকে পিস্তলটা হাতে চলে এল, তাকিয়ে আছে কবাটের দিকে।

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল উত্তরা, গাল দুটো পাকা আপেলের মত রাঙা হয়ে আছে, ভরাট নিতম্বে সেঁটে আছে রঙচঙে স্কার্ট।

'রানা!' রানার ঘুম ঘুম চোখ দেখল, তারপর বিছানার একপাশে সাজানো পরিচ্ছদগুলোর উপর চট করে একবার নজর বুলিয়ে নিল উত্তরা। তারপর চোখ বুজল, নিঃশব্দে হাসছে।

'সেই স্বপ্নটার কথা মনে পড়ে গেল বুঝি?'

চোখ খুলল উত্তরা। 'যেন কত যুগ আগের কথা, তুমি বললে বলে মনে পড়ল,' দুষ্ট হাসি তার ঠোঁটে। 'কিন্তু এ-সব কী?' আবার বিছানায় সাজানো জিনিসগুলোর দিকে তাকাল।

'আগে স্নানটা সেরে নাও, তারপর এগুলো পরে ফেলো তো ঝটপট,' বলল রানা, হাসল।

'কিন্তু... কেন?'

'আমি চাইছি, তাই!'

'কিন্তু আমি কি পারব? সেই কবে শিখিয়েছিল লাবণী।'

মনে করিয়ে দিল রানা, 'আমি তো আছি, বাঙালি– ঠেকলে দেখিয়ে দেব।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল উত্তরা, দশ মিনিট পর যখন বেরিয়ে এল, হাঁ হয়ে গেল রানার মুখ। এ কাকে দেখছে ও! শাড়ি-ব্লাউস পরা নিখুঁত এক অপরূপা বাঙালি মেয়ে। ছোট্ট একটা টিপও পরেছে কপালে। পোশাক পরিবর্তনের সঙ্গে গোটা চরিত্রটাই যেন বদলে গেছে উত্তরার।

'কী দেখছ?'

'তোমাকে,' বলল রানা। 'আমার বাঙালি রাজকন্যেকে।'

আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল উত্তরার মুখ, চোখের দৃষ্টিতে

বিজয়ের গৌরব– যেন বাঙালি কোনও প্রতিযোগী মিস ইউনিভার্স হয়েছে। তার কালো চুল কালো মিহি সিল্ক দিয়ে কাঁধ ও ঘাড়ের উপর স্তূপ করা, হাত দুটো দুদিকে মেলে দিয়ে খাটের চারপাশে নাচল ও মনের আনন্দে। যেন হঠাৎ ঘরে ঢুকে নেচে বেড়াচ্ছে রঙীন এক প্রজাপতি; এমন একটা গানের সুরে তাল মিলিয়ে, যেটা একা শুধু সেই শুনতে পাচ্ছে।

মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে রানা। একটু একটু করে কাছে এগিয়ে এল ও, তারপর ঝপাং করে বসল স্প্রিঙের খাটে। বিছানা দুলে ওঠায় স্লিপিংগাউনটা সরে গিয়ে রানার পেশিবহুল ঊরু বেরিয়ে পড়ল।

'এ, মা!' বলে একটু সরে বসল উত্তরা। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'বাক্সটা কীসের? কী আছে ওটায়?'

'খুলেই দেখো না,' বলল রানা।

কৌতূহলে অধীর, কী এমন থাকতে পারে ওতে, ভাবতে ভাবতে বাক্সটা খুলল উত্তরা। পরমুহূর্তে স্থির হয়ে গেল। বাক্সের ভিতর মোমবাতি দিয়ে সাজানো একটা কেক, তাতে নানারঙের ক্রিম দিয়ে লেখা– হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ।

মুখ তুলল উত্তরা। যতটা সে খুশি হয়েছে, তারচেয়ে বিস্ময়ের মাত্রা বেশি তো কম নয়। 'কে বলল তোমাকে আজ আমার জন্মদিন?'

'তুমি,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'ঘুমের মধ্যে যারা কথা বলে তাদের অনেক গোপন তথ্যই ফাঁস হয়ে যায়।' হাসল ও, উঠে এল বিছানা ছেড়ে। লাইটার জ্বেলে মোমগুলো জ্বালাবার পর ছুরিটা ধরিয়ে দিল উত্তরার হাতে। 'নাও, শুরু করো– হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউউউ...' শ্যাম্পেনের কর্ক মৃদু আওয়াজ তুলে খুশির সঙ্গে যোগ করল আরও একটু খুশি।

রানাকে এক টুকরো কেক, তার সঙ্গে একটা চুমোও দিল উত্তরা। 'ধন্যবাদ! ধন্যবাদ!' রানার কাঁধে মাথা রাখল ও, রানার

গালে ওর গরম নিঃশ্বাস। অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে অনেকক্ষণ বসে থাকল ওরা, উপভোগ করছে পরস্পরের সান্নিধ্য।

'মোহনার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে?' জানতে চাইল রানা।

'উম্‌ম্‌-ম্‌ম্‌।'

'কী ঠিক হলো?'

'ওখানে তুমি আমার শিকার হিসেবে যাবে। আমি একটা বেশ্যা, তুমি আমার কাস্টোমার,' বলল উত্তরা। রানার একটা হাত ওর পিঠ ঘুরে বগলের নীচ দিয়ে সামনে চলে এল। 'উফ্‌!' কিছু একটা করেছে রানা, ব্যথার ভান করে গুঙিয়ে উঠল সে। আরও একটু হেলান দিল ওর গায়ে।

আট

চিয়াং মাই শহর। মাঝরাত।

ফুটপাথ ধরে হাঁটছে রানা ও উত্তরা। বড় আকারের সুদৃশ্য দালানগুলোকে পাশ কাটাচ্ছে ওরা। আলোকিত প্রতিটি জানালায় ভারী পরদা ঝুলছে। রাস্তা ও ফুটপাথ পাথরে বাঁধানো, ফুটপাথের পাশে সযত্নলালিত ঘাস। প্রায় প্রতিটি বাড়ির সামনে সবুজ লন কিংবা বাগান।

রাতের বাতাস বেশ ঠাণ্ডা। জিনস, শার্ট ও জ্যাকেট পরে বেরিয়েছে ওরা। দুজনেই নিজেদের চেহারা বদলে নিয়েছে, সহজে যাতে কেউ চিনতে না পারে।

ফুটপাথে লোকজন না থাকারই মত। তবে রাস্তায় দামী গাড়ির আসা-যাওয়া আছে। এদিকটায় ধনী লোকের বসবাস।

কিছু বিদেশিও থাকে।

'ওদিকে,' হাত তুলে দেখাল উত্তরা, 'চিয়াং মাই পুলিশ হেডকোয়ার্টার।'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

ওর হাতে মৃদু চাপ দিল উত্তরা। তৃপ্তির উচ্ছ্বাস হাসি হয়ে বেরিয়ে এল তার বুকের ভিতর থেকে। 'রানা, কী বলব, তোমার সঙ্গ আমার এত ভাল লাগছে যে রীতিমত ভয় করছে– তুমি চলে যাবার পর কী হবে!'

'সুযোগ পেলেই টেলিফোনে কথা বলব আমরা,' বলল রানা। 'মাঝে-মধ্যে দেখাও হয়ে যাবে; হয় আমার দেশে, নয় তোমার।'

'প্রমিজ?'

'প্রমিজ।' তার কাঁধে হাত রেখে আশ্বস্ত করল রানা।

আবার হেসে উঠল উত্তরা। 'পরের রাস্তাতেই টি.আই.বি-র একটা ব্রাঞ্চ অফিস,' হাসি থামিয়ে বলল সে।

ওদের পায়ের আওয়াজ প্রতিধ্বনি তুলছে। সামনে আলো ঝলমলে ফাইভ স্টার হোটেল আবাসন ইন্টারন্যাশনাল, পাশেই বিরাট ক্যাসিনো– অ্যারাবিয়ান নাইটস্।

রানার কানে ফিসফিস করল উত্তরা, 'ব্যাংকক থেকেও ইন্টেলিজেন্স অফিসাররা এখানে সময় কাটাতে আসে। দেশি-বিদেশি স্পাইদের মিলন-মেলা বলতে পার শহরের এই অংশটাকে।'

হোটেল ও ক্যাসিনোর দু'পাশে সারি সারি দামি গাড়ি পার্ক করা রয়েছে। গেটের কাছে ওদের মত কিছু তরুণ-তরুণীকে দেখা গেল, একটা গ্রুপ সিগারেট ধরাবার ফাঁকে কী নিয়ে যেন হাসাহাসি করছে, আরেক গ্রুপের কয়েকটা ছেলে রানা ও উত্তরাকে হেঁটে আসতে দেখে সিটি বাজাল।

কোনও ঝামেলা ছাড়াই ওদেরকে পাশ কাটিয়ে এল দুজন।

অবশেষে এলাকাটার শেষপ্রান্তে পৌঁছে, ফাঁকা মাঠের মাঝখানে, বড়সড় একটা অন্ধকার বাড়ির সামনে থামল উত্তরা।

দেখেই ভৌতিক ও অশুভ বলে মনে হলো বাড়িটাকে রানার। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না এখানে কেউ বসবাস করে।

'পেছন দিকে যেতে হবে,' ফিসফিস করে বলল উত্তরা।

বাতাসে ধুলোর গন্ধ, গাড়িপথ ধরে এগোল ওরা। পথের মাঝখানে একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে, চাঁদের আলোয় মরচে ধরা বলে মনে হলো রানার– ওখানে ব্যারিকেড কিংবা ওয়ার্নিং হিসাবে রাখা হয়েছে ওটাকে।

পাঁচিল আর ট্রাকের মাঝখানে সামান্য একটু ফাঁক, সেটা গলে এগোতে হলো ওদেরকে।

বাড়িটার পিছনে, দরজার মাথায়, পঁচিশ ওয়াট-এর একটা বালব জ্বলছে। থুতু দিয়ে আঙুলের ডগা ভিজিয়ে নিয়ে বালবটা স্পর্শ করল উত্তরা।

সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল দরজা।

'এসো!' অন্ধকারে শ্রুতিমধুর, ফিসফিসে একটা নারীকণ্ঠ শুনতে পেল রানা। 'জলদি!'

উত্তরার পিছু নিয়ে ভিতরে ঢুকল রানা। দরজাটা সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল আবার।

বোতামে চাপ দিয়ে একটা বৈদ্যুতিক লণ্ঠন জ্বালল কেউ। ওদের দিকে তাকিয়ে হাসছে লম্বা একটা মেয়ে। আশ্চর্য সুন্দরী সে; মেকআপ নেওয়ার কোনও প্রয়োজন পড়ে না, তারপরও প্রচুর রুজ-লিপস্টিক ব্যবহার করেছে। তবে, এত করেও, চেহারা থেকে শান্ত ও মার্জিত ভাবটুকু মুছতে পারেনি।

'পরিচয় করিয়ে দিই,' বলল উত্তরা। 'আমার কলিগ মোহনা কীর্তিকাচরণ, টিসিআই। কায়েস ভাইয়ের বস্, মাসুদ রানা, বিসিআই।'

পরস্পরের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল ওরা।

ওখানে কোনও কথা হলো না, মোহনা শুধু বলল, 'এসো আমার সঙ্গে!' ঘুরে প্যাসেজ ধরে হাঁটতে শুরু করল সে। সামনে একটা সিঁড়ি পড়ল, ধাপ বেয়ে সম্ভবত বেযমেন্টে নেমে যাচ্ছে ওরা।

'তোমরা দেরি করে পৌঁছালে,' পিছনদিকে একবার তাকিয়ে উত্তরাকে বলল মোহনা।

বেযমেন্টটা বেশ বড়। একধারে একটা বার। পাশে একটা টিভি, পরদায় ব্রিটনি স্পিয়ার্স গান গাইলেও, মিউট করা। বারের সামনে লম্বা একটা টেবিল ও কয়েকটা চেয়ার। টেবিলের উপর ক্লোজ-সার্কিট টিভি রয়েছে পাঁচ-ছয়টা, এই মুহূর্তে অফ করা। টিভিগুলোর সামনে পড়ে রয়েছে একাধিক হেডফোন, রেকর্ড প্লেয়ার ইত্যাদি।

এটা একটা ব্রথেল, মেয়েদের কামরায় ঢোকার পর কাস্টোমাররা কী করে আর কী বলে সব এখানে বসে দেখা ও শোনা যায়, এটুকু বুঝতে কারও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

'মাসুদ ভাই,' সরাসরি এভাবেই সম্বোধন করল মোহনা। 'কোনও ভূমিকার কি প্রয়োজন আছে?' নিচু গলায় জানতে চাইল সে। 'এত থাকতে এই নোংরা জায়গায় কী করছি আমি ইত্যাদি?'

মাথা নাড়ল রানা।

'শুধু একটা কথা বলি। কায়েস নেই, তো আমিও নেই। তা হলে বেঁচে আছি কীভাবে? আমার ভেতরে প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে, সেই আগুনটাই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।'

এই মুহূর্তে রানা মনোযোগী শ্রোতা মাত্র।

'তোমার কথা কায়েস এত বেশি বলেছে আমাকে, দেখার পর তোমাকে অচেনা কেউ বলে ভাবতেই পারছি না।' মাথার চুল ঠিক করবার ছলে শার্টের আস্তিন দিয়ে চোখ মুছল মোহনা,

তার ধারণা ব্যাপারটা কেউ ধরতে পারছে না। 'আমাদের হাতে সময় খুব কম।' বার-এর সামনে এসে একটা আধ খালি গ্লাস তুলে চুমুক দিল কয়েকটা। 'কেউ যদি কিছু নিতে চাও, হাত বাড়াও,' বলে শেলফে সাজানো বোতলগুলোর দিকে ইঙ্গিত করল সে।

'না, দরকার নেই,' বলল রানা।

'না,' বলল উত্তরাও। 'অন্য কোনও দিন।'

'ঠিক আছে,' একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বলল উত্তরা।

'খুব বেশি তথ্য যোগাড় করতে পারিনি আমি,' বেযমেন্টের বন্ধ দরজার দিকে চোখ রেখে বলল মোহনা। 'যেটুকু জেনেছি তা কতটুকু কী কাজে লাগবে তা-ও আমি জানি না। প্লেনটা ওখানে বেশ কিছুদিন আগে থেকেই ছিল, কতদিন আগে থেকে তা জানতে পারিনি।'

'দোই ইনথাননে?'

'হ্যাঁ। ছিল, কিন্তু আবার চলে যায়, তারপর ফিরেও আসে।'

'তারিখ জানতে পেরেছ?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'কবে গেল, কবে ফিরল?'

মাথা নাড়ল মোহনা।

'শুনলাম আবারও নাকি বের করা হয়েছে?'

'হ্যাঁ।' মাথা ঝাঁকাল মোহনা। 'সিঙ্গাপুর না মালয়েশিয়া থেকে বাঙালি একজন বিজ্ঞানীকে নিয়ে এসেছে ওরা, তিনি নাকি ওটাকে লেজের ওপর দাঁড় করিয়ে নাচাতে পারবেন, মহাশূন্য থেকে ঘুরিয়ে আনতে পারবেন, এই সব কথা কানে আসছে।'

রানা ও উত্তরা দৃষ্টি বিনিময় করল।

'আবার এ-ও শুনছি যে তিনি ওদেরকে সাহায্য করতে রাজি হচ্ছেন না,' বলল মোহনা। 'নির্যাতন চালিয়ে বাধ্য করবে, সে উপায়ও নেই। কারণ বিজ্ঞানী মারা গেলে তাঁর সঙ্গে অমূল্য সব আবিষ্কারের সূত্রও চিরকালের জন্যে হারিয়ে যাবে।'

‘ডক্টর নাদিরা?’ রানার দিকে ফিরে ফিসফিস করল উত্তরা।

‘তাই তো মনে হচ্ছে,’ বলল রানা। ‘মোহনা, ওটা দুরন্ত ঈগল কি না তা কি তুমি জানতে পারনি?’

মাথা নাড়ল মোহনা।

‘একটু তোতলায়, থাই টঙের এমন কাউকে চেনো?’ জিজ্ঞেস করল রানা। ‘গলার আওয়াজ খুব ভারী?’

ভ্রূ কোঁচকাল মোহনা। উত্তরার সঙ্গে চট করে একবার দৃষ্টি বিনিময় করল। ‘ওদের তো অনেককেই চিনি,’ বলল সে। ‘কার কথা বলছেন ঠিক বুঝতে পারছি না। তোতলায়? উঁহুঁ! কেন বলুন তো?’

‘থাই টঙের ওই তোতলা লোকটাই আামদের বিজ্ঞানীকে থাই থান্ডারের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে।’

রানা আর কী বলে শোনার অপেক্ষায় রয়েছে মোহনা।

‘ওই তোতলা যেখানে আছে, ডক্টর নাদিরারও সেখানে থাকার কথা,’ বলল রানা।

মাথা নাড়ল মোহনা, উত্তরার সঙ্গে আরেকবার দৃষ্টি বিনিময় করল। ‘কোথাও ভুল হচ্ছে, মাসুদ ভাই। যে লোকটা তোতলায় সে থাই টঙের সদস্য নয়।’

‘তা হলে?’ এবার রানার ভ্রূ কোঁচকানোর পালা।

‘চিয়াং মাই শহরে থাই ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ-এর একটা অফিস আছে, সেই অফিসের হেড একটা সুপারপাওয়ারকে সাহায্য করছে বলে শুনেছি। উত্তরাও তাকে চেনে। ওই লোকটা তোতলা। তার নাম জুতনা মংকট।’

‘এখন সে কোথায়?’

‘শেষ খবর জানি, শহর ছেড়ে পশ্চিম দিকে গেছে সে,’ বলল মোহনা।

‘দুর্গের দিকে?’ জিজ্ঞেস করল উত্তরা।

‘হতে পারে। ঠিক জানি না।’

রানার দিকে তাকাল উত্তরা। 'আমি একবার আমাদের প্রজাদের কাছে যেতে চাই,' বলল সে। 'নায়েব সাহেবের সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

বার-এর মাথায় মরিচ বাতি জ্বলে উঠল– বুদ্ধমূর্তির নাকের ভিতর খুদে বালব।

'সেরেছে!' বিড়বিড় করল মোহনা।

'কাস্টোমার,' বলল রানা।

'বেরুবার আর কোনও পথ নেই?' জানতে চাইল উত্তরা।

'কী যে বলো না! এসো, তাড়াতাড়ি!'

মোহনার পিছু নিয়ে বেযমেন্ট থেকে প্যাসেজে উঠে এল ওরা। খানিক দূর এগিয়ে একটা দরজা খুলল সে, ঠেলে ভিতরে ঢুকিয়ে দিল ওদেরকে। 'এখানে অপেক্ষা করো,' বলল সে। 'আমি ওর একটা ব্যবস্থা করছি।'

নিজের চুল ঠিকঠাক করল মোহনা, হাতব্যাগ থেকে ছোট্ট একটা আয়না বের করে নিজেকে একবার দেখে নিল, তারপর কামরা থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল দরজাটা। তার ত্রস্ত পায়ের শব্দ প্যাসেজ ধরে দূরে সরে যাচ্ছে।

রানার দিকে তাকাল উত্তরা। 'অবশেষে আমরা নির্জনতা পেলাম।'

'কী কাজে লাগবে সেটা?' নিঃশব্দে হাসল রানা, 'এখানে যা হয়?'

কিল দেখাল উত্তরা। দূর থেকে দরজা খোলার আওয়াজ ভেসে এল। দুজন মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে ওরা, মোহনা আর একজন পুরুষের। হাসাহাসি করছে দুজন, বোধহয় ব্যবসা হবে। প্যাসেজ ধরে এগিয়ে আসছে ওদের পায়ের আওয়াজ।

একটা দরজায় নক হলো। কবাট খোলার আওয়াজ। আরও এক দফা কথাবার্তা। এরপর দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দটা খুব

নরম।

রানার হাত ধরল উত্তরা, একটু নার্ভাস।

দরজা খুলে ভিতরে পুরোপুরি ঢুকল না মোহনা, উত্তরার জ্যাকেটের আস্তিন ধরে টান দিল। 'এসো! জলদি!'

লম্বা প্যাসেজে বেরিয়ে এসে দ্রুত হাঁটছে তিনজন। দু'পাশের কামরা থেকে টিভি চলার আওয়াজ ভেসে আসছে। বাড়ির পিছনে পৌঁছে বৈদ্যুতিক লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিল মোহনা, তারপর দরজা খুলল।

তিনজনই ওরা দেখল সামনে একটা লম্বা ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে।

নয়

দরজার মাথার বালব ছোঁয়ার জন্য হাত তুলেছে লোকটা, কবাট ফাঁক হয়ে যাওয়ায় স্থির হয়ে গেল, চোখে-মুখে বিস্ময়। চেহারায় নিরীহ ভাব, যেন ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানে না; পকেট ভর্তি টাকা নিয়ে ফুর্তি করতে এসেছে।

'মোহনা,' বলল লোকটা, রানা ও উত্তরাকে এমন খুঁটিয়ে দেখে রাখছে যেন ভবিষ্যতে ব্ল্যাকমেইল করতে কোনও অসুবিধে না হয়।

টলে ওঠার অভিনয় করল রানা, ওর কাঁধটা দরজার ফ্রেমে ঘষা খেল। 'চলে এসো, ডার্লিং!' জড়ানো সুরে থাই ভাষায় বলল উত্তরাকে।

হেসে উঠল উত্তরা, রানার হাত ধরে চাপ দিল মৃদু। রানার

কানে অত্যন্ত বেসুরো লাগল তার হাসি। চাপটুকুর অর্থও ধরতে পারল না।

'তোমরা দুজন দয়া করে বিদায় হও!' ধমকের সুরে বলল মোহনা, পিঠে ধাক্কা দিয়ে দরজার বাইরে বের করে দিল ওদের দুজনকে।

'চলো, পার্কে গিয়ে বসি আমরা, ডার্লিং,' বলল রানা, নিজের শরীর দিয়ে উত্তরাকে আড়াল করে রাখছে। এলোমেলো পা ফেলে অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে দুজন।

'আমার পেছনে মেলা খরচ হবে তোমার,' বলল উত্তরা। 'তবে কথা দিতে পারি যে পস্তাবে না।'

'ভেতরে আসুন, সার!' ওদের পিছন থেকে মোহনার গলা ভেসে এল। তারপর কাস্টোমারের কী একটা কথার জবাবে হাসল সে। হাসিটার সুরে এমন কিছু আছে, রানার মনে হলো লোকটাকে মোহনা হয় ভয় করে, না হয় শ্রদ্ধা।

'তুমি তখন আমার হাতে চাপ দিলে কেন?' উত্তরাকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'শুনে আবার আকাশ থেকে পোড়ো না,' সাবধান করে দিয়ে বলল উত্তরা, এখনও কিছুটা নার্ভাস সে। 'কে জানে চিনে ফেললেন কি না!'

'মানে?' জানতে চাইল রানা। 'কে লোকটা?'

'আমাদের অপারেশন্স চিফ, সত্যশুভ চুনাভান,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল উত্তরা।

'এখানে কী করছেন ভদ্রলোক?'

'নিশ্চয়ই মোহনার কাছ থেকে রিপোর্ট নিতে এসেছেন,' বলল উত্তরা।

'ঠিক আছে, বুঝলাম, কিন্তু তাতে তোমার নার্ভাস হবার কী আছে?'

'আমি নার্ভাস এই জন্যে যে নিজের ডিউটি সম্পর্কে এখনও

রিপোর্ট করিনি,' বলল উত্তরা। 'যদি চিনতে পেরে থাকেন, জেরা করবেন আমাকে।'

'জানতে পারি, তোমার ডিউটিটা কি?' অন্ধকার মাঠ পিছনে ফেলে আলোকিত মেইন রোডে উঠে এল ওরা।

জবাব দিতে এক মুহূর্ত দেরি করল উত্তরা। 'আমার ডিউটি, বাংলাদেশ থেকে যদি কেউ আসে, তার গতিবিধির ওপর নজর রাখা, সে কী করছে না করছে রিপোর্ট করা।'

'ঠিক তা-ই করছ তুমি, আমার গতিবিধির ওপর নজর রাখছ,' বলল রানা। 'তা হলে রিপোর্ট করছ না কেন?'

হেসে ফেলল উত্তরা। 'যার ওপর নজর রাখছি তার সঙ্গেই যদি প্রেম করতে হয়, রিপোর্ট করার সময় পাব কীভাবে?' কাঁধ ঝাঁকাল। 'এবার অবশ্য করতেই হবে।'

ক্যাসিনো অ্যারাবিয়ান নাইটস্‌কে পিছনে ফেলে নিজেদের হোটেল ময়ূরীর কাছে চলে এল ওরা।

'আসলে কী ঘটছে জানতে হলে দোই ইনথাননে ফিরতে হবে আমাকে,' বলল উত্তরা। 'জেটটা বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে। আমি ভয় পাচ্ছি নতুন ঘর-বাড়িতে আবার না আগুন লাগে, প্রজারা না মারা যায়! অস্ত্র হিসেবে লেযার অত্যন্ত ভয়ংকর!'

এত রাতেও ট্যুরিস্টের ভিড়ে গম গম করছে হোটেল ময়ূরী। তিনতলার একটা রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড বার-এ ঢুকল ওরা, এখানেও প্রচুর লোকজন খাওয়াদাওয়া কিংবা পান করবার ফাঁকে গল্পগুজব করছে।

হেড ওয়েটার আইল ধরে বেশ কিছুটা হাঁটিয়ে এনে একটা টেবিলের ব্যবস্থা করে দিল ওদেরকে।

দুটো বিয়ার নিয়ে চুমুক দিল ওরা, তারপর বিল মিটিয়ে ছয় তলায় ওঠার জন্য পরস্পরের হাত ধরে সিঁড়ি ভাঙছে।

'আমি আমার প্রজাদের কাছে ফিরছি,' মৃদু কণ্ঠে বলল

উত্তরা। 'তুমি ভেবেচিন্তে বের করো কীভাবে ওই জেটটাকে ধ্বংস করা যায়। ওটাকে ধ্বংস করাই উচিত, কি বলো?'

'হয়তো,' বলল রানা। 'তবে প্রথমে আমি আমার হেড-কোয়ার্টারকে দিয়ে আমার একটা ধারণা চেক করিয়ে নিতে চাই। আমরা যতটুকু বুঝতে পারছি, হয়তো তারচেয়ে অনেক বড় ষড়যন্ত্রের জাল বিছানো হয়েছে এখানে।' উত্তরার নিরাপত্তার কথা ভেবেই জিয়া ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে দুরন্ত ঈগলকে পুড়িয়ে ফেলার ঘটনাটা চেপে রেখেছে ও। 'তারপর তোমাকে আমি দোই ইনথাননে নিয়ে যাব।'

'তুমি আমার সঙ্গে স্যুইট থেকে যোগাযোগ করতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল উত্তরা।

'হ্যাঁ, আমার সুটকেসের কাছে পৌঁছেই।'

'বেশ। নীচে নেমে বিল মেটাই আমি,' বলল উত্তরা, সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে পড়ল। 'তা হলে সঙ্গে সঙ্গে রওনা হতে পারব আমরা। আমাদের হাতে নষ্ট করার মত সময় নেই।'

তাকে একটা চুমো খেল রানা। চারতলা থেকে নামতে শুরু করল উত্তরা। রানা উঠে যাচ্ছে ছয়তলায়।

ছয়তলায় উঠে এসে করিডরে কাউকে দেখল না রানা। একপাশে দাঁড়িয়ে দরজার মাথায় হাত বুলাচ্ছে ও। কাগজের একটা টুকরোকে গোল পাকিয়ে যেখানে রেখে গিয়েছিল এখন সেটা সেখানে নেই। হয় পরিষ্কার করবার জন্য কোনও মেইড ঢুকেছে স্যুইটের ভিতরে, নয়তো কোনও ক্রিমিনাল বা শত্রুপক্ষ।

এত রাতে মেইড ঢোকার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

শোল্ডার হোলস্টার থেকে হাতে চলে এল পিস্তলটা। পকেট থেকে স্যুইটের চাবিও বেরিয়ে এল অপর হাতে। নিঃশব্দে দরজার তালা খুলল ও।

বিরাট করিডরের নীরবতা কানে প্রতিধ্বনি তুলছে।

দেয়ালের গায়ে সেঁটে আছে শরীরটা, ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল দরজার কবাট।

অন্ধকার কামরা। নীরব।

দরজার চৌকাঠে পিঠ সাঁটিয়ে ভিতরে ঢুকল রানা, হাত বাড়িয়ে আলোর সুইচ অন করল।

কবাটের পিছন থেকে ওর পিস্তল লক্ষ্য করে থাবা মারল একটা হাত। তৈরি ছিল রানা; থাবাটা এড়িয়ে সরু একজোড়া চোখের মাঝখানে, হলুদ রঙের চ্যাপ্টা নাকে, প্রায় গেঁথে দিল ওয়ালথারের ব্যারেল।

লোকটার নাক-মুখ থেকে ঝরঝর করে রক্ত বেরুচ্ছে, ক্ষতটা চেপে ধরে মেঝেতে বসে পড়ল সে।

'ধ-ধরো ওকে!' ভারী কণ্ঠস্বর তোতলাচ্ছে। 'ধ-ধরো!'

সব মিলিয়ে চারজন ওরা। দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিল একজন। আরেকজন রানার পা লক্ষ্য করে ডাইভ দিল। বোঝা গেল, ওরা জ্যান্ত ধরতে চায় রানাকে।

রানার ভাঁজ করা হাঁটু মস্ত হাতুড়ির মত আঘাত করল ডাইভ দেওয়া লোকটার নাকে-মুখে। লোকটার মাথা ঝাঁকি খেল পিছনদিকে। ঘাড় ভাঙার আওয়াজ প্রতিধ্বনি তুলল সিটিং রুমে। মুহূর্তের জন্য তীক্ষ্ণ, রোমহর্ষক আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল তার গলা থেকে। তারপর স্থির হয়ে গেল শরীরটা।

'স্ট-স্টপ, এমআরনাইন!' হুমকির সুরে বলল তোতলা, .৪৫-এর ঠাণ্ডা মাজল চেপে ধরেছে রানার গলার পাশে।

অকস্মাৎ একটা ঘূর্ণির মত ঝাপসা দেখাল রানাকে, বাহুর নার্ভসেন্টারে কারাতের কোপ মেরে বিস্মিত তোতলার হাত অবশ করে দিয়েছে; ছিটকে মেঝেতে পড়েছে ওর হাতের .৪৫।

লোকটা লম্বা, চেহারায় থাই বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট, মুখে কালো তিল গিজগিজ করছে।

এই লোক থাই ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ-এর এজেন্ট, জুতনা

মংকট, মুরুব্বির নির্দেশে থাই টঙের দলে ভিড়ে গেছে।

তোতলার চোয়ালটাকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রচণ্ড একটা ঘুসি চালাল রানা। ঝপ করে নিচু হয়ে আঘাতটা অনায়াসে এড়াল মংকট, তারপর লাফ দিয়ে সরে গেল ওর নাগালের বাইরে। আনআর্মড কমব্যাটে ভালই ট্রেনিং নেওয়া আছে তার।

মংকট আর তার অক্ষত সঙ্গী দৃষ্টি বিনিময় করল, তারপর দুজন দু'পাশ থেকে রানার দিকে এগোল। ওদের চোখ থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে ঘৃণা আর একগুঁয়েমির অদৃশ্য আগুন।

আবার ঝাপসা ঘূর্ণি হলো রানার কাঠামো, ওর ডান পায়ের লাথি লাগল তোতলা মংকটের চোয়ালে, প্রায় একই সঙ্গে দ্বিতীয় লোকটা ঘুসি খেল পেটে। চোয়ালের শক্ত হাড়ের সঙ্গে বুটের সংঘর্ষে ফাঁপা আওয়াজ হলো, শব্দটা কানে ঢুকতে সন্তুষ্টি বোধ করল রানা। সেই সঙ্গে অনুভব করল দ্বিতীয় লোকটার নাড়িভূঁড়ি মেরুদণ্ডের সঙ্গে পিষে দিয়েছে ও।

পিছু হটল রানা।

তিন টং সদস্য আর একজন থাই আই.বি এজেন্ট মেঝেতে পড়ে আছে। তিনজনই অজ্ঞান, শুধু ভাঙা নাক নিয়ে মৃদুকণ্ঠে কাতরাচ্ছে একজন।

দ্রুত হাতে নিজের ও উত্তরার লাগেজ গুছিয়ে নিল রানা। জেরা করবার জন্যে ওদের জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে ও, কিন্তু তাতে ঝুঁকি আছে– ওদের ব্যাকআপ টিম চলে আসতে পারে।

ছদ্মবেশে থাকা সত্ত্বেও হোটেলের কেউ নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছে ওকে, থাই ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ-এর লোকাল অফিসকে খবরটা দিতেও দেরি করেনি সে। তা না হলে তোতলা ওকে এমআরনাইন বলে সম্বোধন করত না।

জেট প্লেনটার কাছে ফেরার তাগাদা অনুভব করছে রানা। বিজ্ঞানী ডক্টর নাদিরাকে ওখানেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মোহনার

রিপোর্ট ছিল, তোতলা মংকট পশ্চিমে গেছে। সেটা যদি সত্যি হয়, পশ্চিমে গিয়েও আবার চিয়াং মাই শহরে ফিরে এসেছে সে।

তার ফিরে আসবার সম্ভাব্য একটা কারণই থাকতে পারে, বিজ্ঞানীর মুখ খোলাবার উপায় বের করা। দোই ইনথানন থেকে অন্য কোনও কাজে চিয়াং মাইয়ে এসে থাকলে রানার জন্য ফাঁদ পাতত না সে। এই কাজটা দিয়েই শহরে ফেরত পাঠানো হয়েছে তাকে– রানাকে বন্দি করে ডক্টর নাদিরার কাছে নিয়ে যেতে হবে।

চারজনকেই বাঁধল রানা, তারপর স্যুইটে তালা দিয়ে নীচে নেমে এল উত্তরার খোঁজে।

রিসেপশন কাউন্টারের পিছনে বসা তরুণী বলল, উত্তরাকে দেখেনি সে। খাতা খুলল সে, ব্যাগ ও সুটকেসটা দেখল, তারপর রানাকে জিজ্ঞেস করল বিল মেটাবে কি না। মাথা ঝাঁকিয়ে পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করল রানা, লবির সচল ভিড়ে বারবার চোখ বুলাচ্ছে।

কোথাও উত্তরার ছায়া মাত্র দেখা যাচ্ছে না। রানার হাতে এত সময় নেই যে ওকে খুঁজে বের করবে। থাই টঙের শ্বেতাঙ্গ মিত্ররা সিদ্ধান্ত নিতে পারে, একেবারে কোনও তথ্য না পাওয়ার চেয়ে ড্রাগস ব্যবহার করে কিংবা নির্যাতন চালিয়ে যতটুকু পারা যায় আদায় করে নেওয়া ভাল, তাতে যদি বাঙালি বিজ্ঞানী মারা যায় তো গেল।

কিন্তু উত্তরা! মেয়েটি কি পালিয়ে গেল? নাকি ধরা পড়েছে? খুন হয়ে যায়নি তো?

এলিভেটরে চড়ে বেযমেন্ট গ্যারেজে নেমে এল রানা। চিয়াং মাই শহরে উত্তরার পরিচিত লোকজন আছে, এমনকী ইমিডিয়েট বস্‌কেও কাছাকাছি পাবে সে। কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় তার সঙ্গে দোই ইনথাননের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে?

যাওয়ার আগে অন্তত ওকে একটা ফোন করতে পারত।

চোখে-মুখে রাগ, এলিভেটর থেকে নেমে পোর্শ-এর দিকে এগোল রানা। মানসের কথা মনে পড়ল, ভাবল– আরেক জোকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সুযোগ পেলেই গায়েব হয়ে যাবে!

গাড়ির টায়ারে একটা লাথি মারল রানা। এই মুহূর্তে ওদের দুজনেরই হয়তো ওর সাহায্য দরকার।

ওকে আরও খেপিয়ে দিয়ে পোর্শ-এর পাশে পার্ক করা মার্সিডিজ থেকে বেরিয়ে এল দুই চিনা পাহাড়। কেউ কারও চেয়ে কম যায় না– নির্ঘাত ছয় ফুট লম্বা, আড়াই মণ ওজন। প্রায় এক রকমই চেহারা, যমজ না হয়ে যায় না, একজনের মাথার চুল কামানো।

চোখ-মুখই বলে দিচ্ছে, খুঁজলে খুলির ভিতর হলুদ পদার্থ পাওয়া যাবে না। গায়ে সস্তাদরের প্যান্ট-শার্ট, দাড়ি কামায়নি কয়েকদিন। মার্সিডিজের দরজা দুটো সশব্দে বন্ধ করল ওরা।

ঝট করে পুরোপুরি ওদের দিকে ঘুরে গেল রানা। 'উত্তরা কোথায়?' খেঁকিয়ে উঠল ও।

এগোতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল ওরা, রানার রাগের বহর দেখে হকচকিয়ে গেছে। সন্দেহ নেই, তোতলা মংকটই এই দুই গবেটকে পোর্শ-এর পাহারায় রেখে গেছে।

পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা, ভ্রূতে যেন গিঁট পড়েছে। বুদ্ধি কম থাকতে পারে, হয়তো শক্তি দিয়ে সেটা পুষিয়ে নেয় ওরা। হয়তো নির্দেশ পালনে নিষ্ঠার পরিচয় দেয়।

'শালা বেজন্মারা, কোথায় উত্তরা?'

এই মুহূর্তে সম্ভবত মনে পড়ে গেল কী নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ওদেরকে। মাথা নিচু করল ওরা, বেল্টে গোঁজা খাটো হাতলসহ একটা করে হাতুড়ি বের করল, যে যার হাতের তালুতে ঠুকছে। ভীতিকর একটা ভঙ্গি নিয়ে রানার দিকে এগিয়ে আসছে দুজন, প্রয়োজনে ব্যবহার করবে ওগুলো।

'কথা বলতে জানে না,' বিড়বিড় করল রানা। 'বোধহয়

পড়তেও জানে না। মগজে কিছু থাকলে তো!'

অকস্মাৎ মার্সিডিজের ট্রাঙ্ক চাপড়াতে শুরু করল কেউ। নীরব গ্যারেজের ভিতর ভোঁতা একটা আওয়াজ।

'উত্তরা!' গলা চড়াল রানা।

'সেলাম! নমস্তে! দাদা নাকি?' অস্পষ্ট একটা কণ্ঠস্বর বেরিয়ে এল মার্সিডিজের ট্রাঙ্ক থেকে।

'মানস!' বলল রানা, তারপর নাগালের মধ্যে চলে আসায় বিদ্যুদ্বেগে এক-পা সামনে বেড়ে প্রথম দানবের পেটে প্রচণ্ড একটা ঘুসি মারল। পরমুহূর্তে লাফিয়ে সরে এল।

হুউস্‌স্‌ করে প্রচুর বাতাস ছাড়ল লোকটা, মাথা ঝাঁকাচ্ছে। হাতুড়িটা সবেগে নামিয়ে আনল সে, এক মুহূর্ত আগে ঠিক যেখানে রানার মাথাটা ছিল।

দ্বিতীয় দানবের হাঁটুতে প্রচণ্ড এক সাইড কিক মারল রানা, তারপর একপাক ঘুরে আবার প্রথম লোকটার পেটে স্টিলের পাত বসানো জুতোর আগাটা সেঁধিয়ে দিল। পাথরের মত শক্ত লাগল পেটটা।

যতই মার খাক, রানা বুঝল, দুই যমজের তেমন কিছুই হচ্ছে না, শুধু একটু বোধহয় দিশেহারা হয়ে পড়েছে, ব্যস।

রানাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে দুই যমজ। ওদেরকে এক মুহূর্ত দেখে নিয়ে খানিকটা পিছাল ও, পিস্তলটা বের করল, তারপর পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে লক্ষ্য স্থির করল গাড়ির পিছনের বুটের তালার উপর।

'সাবধান, মানস!'

ট্রিগার টিপল রানা।

মার্সিডিজ ট্রাঙ্কের ঢাকনি খুলে গেল। ওটার ভিতর সিধে হয়ে বসল মানস, নিঃশব্দে হাসছে।

'এর চেয়ে মজার ব্যাপার হয়?' বলল সে। 'কোটা বাহারু থেকে চিয়াং মাই, বুঝলেন না! পনেরোশো কিলোমিটার ফ্রি ট্রিপ,

অথচ ওদের কাছে আমি বেড়ানোর আবদারও করিনি! মাইরি, কী কপাল নিয়ে যে জন্মেছি!’

গুলির আওয়াজে প্রথমে একটু থমকালেও সামলে নিয়ে থাই টঙের দুই যমজ দু’দিক থেকে এগোল ওর দিকে।

দ্বিতীয়, অর্থাৎ টেকো দানবটার পেটে কষে একটা ঘুসি মেরে উল্টোদিকে সরে যাচ্ছে রানা। ‘উত্তরা কোথায়?’ প্রশ্ন করবার সময় প্রথম দানবটার ঊরুসন্ধিতে ভাঁজ করা হাঁটুর গুঁতো দিল।

হাঁটুটা শক্ত প্যাডে লাগল, লোকটার কিছুই হলো না। মারামারি করবার জন্য তৈরি হয়েই এসেছে ওরা।

মার্সিডিজকে ঘুরে পোর্শের দিকে এগোল রানা, রিমোট কন্ট্রোলের সুইচে চাপ দিতেই, খেউ-খেউ করে দুটো ডাক ছেড়ে খুলে গেল সবকটা দরজার লক। ‘ভেতরে ঢুকুন!’ তাগাদা দিল মানসকে।

‘তা আর বলতে!’ আড়ষ্ট ভঙ্গিতে মার্সিডিজের ট্রাঙ্ক থেকে বেরিয়ে এল মানস। ‘আমার যেন মনে হলো এই দুই জানোয়ারের সঙ্গীরা আপনার বান্ধবীকে একটা গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে গেল।’

মার্সিডিজকে পাশ কাটিয়ে রানাকে ধাওয়া করল দুই যমজ, রানাও ওদের নাগালের বাইরে থাকার জন্য ঘুরছে, সেদিকে একটা চোখ রেখে গাড়ির জ্যাক উঁচু করার স্টিলের রডটা তুলে নিল মানস এক হাতে। ব্যাগ আর সুটকেস পোর্শ-এর ব্যাকসিটে ছুঁড়ে দিল। ঠিক তখনই ওর পাশ দিয়ে ন্যাড়া যমজটা রানার দিকে এগোচ্ছে দেখে ধাঁই করে রড চালাল ওর মাথা লক্ষ্য করে। সেই সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, ‘বাপরে! গেছে আমার হাতটা!’

মাথায় বেমক্কা বাড়ি খেয়ে থমকে দাঁড়াল আরব্যোপন্যাসের দৈত্য। রানাকে ছেড়ে ওর দিকে ফিরছে দেখেই একলাফে সরে গেল মানস, তারপর আরেক বাড়ি লাগিয়ে দিল লোকটার কনুই বরাবর। এবং লাফিয়ে উঠে পড়ল গাড়িতে।

‘ভাল করেছেন,’ বলল রানা। ‘এবার স্টার্ট দিন!’

‘মারতে গিয়ে হাতে ব্যথা পেয়েছি, মাইরি!’ গলা চড়িয়ে বলল মানস। ‘গাড়িটা আপনি চালালে ভাল হয়, বুঝলেন না, সার!’

‘তা হলে ড্রাইভারের দরজাটায় ঠেলা দিন!’

গাড়িতে উঠে প্রথমে নিজের দিকের দরজাটা বন্ধ করল মানস, তারপর হাত লম্বা করে ড্রাইভারের দরজা খুলে ফেলল। ‘আমাদের আর দেরি করা উচিত হবে না, হুজুর, মানে, সার,’ বলল সে, জানালার কাঁচ মাত্র ইঞ্চি দুয়েক নামিয়েছে। ‘নাকি এখনও ভাবছেন আপনার পক্ষে ওদেরকে কাবু করা সম্ভব?’

‘চেষ্টা তো করছি!’

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। দুই মাংসের পাহাড় হামলা করতে আসছে ওর উপর। নিঃশব্দে হাসছে ওরা, জানে মেরে ছাতু বানিয়ে ফেলবে শত্রুকে। দু-পাশ থেকে ঝাঁপ দিল ওরা একযোগে।

সম্ভাব্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা, তারপর ঝট করে একপাশে সরে গেল। এই মুহূর্তে বিদ্যুৎ-গতিই ওর একমাত্র সম্বল।

দুই যমজ পাহাড় বুঝতে পারল কী হতে যাচ্ছে। হতাশা ফুটল ওদের বোকা বোকা চেহারায়। অনেক দেরি করে ফেলেছে বুঝতে। সিকি টন করে ওজন ওদের একেকজনের, এবং এই মুহূর্তে নিজেদের গতি নিয়ন্ত্রণ করার সাধ্য নেই কারও।

পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খেল দুটো শরীর, তারপর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে ধড়াস করে পড়ল সান বাঁধানো মেঝেতে। চেহারায় আচ্ছন্ন একটা ভাব। ব্যথাটা কয়েক সেকেন্ড পর অনুভব করবে ওরা। কেউ যদি এরকম প্রকাণ্ড হয়, তার সবকিছুতেই একটু বেশি সময় লাগে।

ওদের শরীর টপকে লাফ দিয়ে গাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ল রানা। লক করল দরজা, ইগনিশনে চাবি ঘোরাল, তারপর

সগর্জনে বেরিয়ে গেল গ্যারেজ থেকে।

দশ

চিয়াং মাই থেকে দোই ইনথানন ষাট কিলোমিটার। ভাল রাস্তার অভাবে পশ্চিমে যাওয়ার জন্য দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে পোর্শ ছোটাচ্ছে রানা, ফলে অনেক বেশি পথ পার হতে হচ্ছে ওদেরকে।

চাঁদ ঢলে পড়লেও, তারার মেলা বসেছে আকাশে। আট কিলোমিটার এগোবার পর মেইন রোড ছেড়ে বনভূমির ভিতর ঢুকল রানা। সম্ভাব্য অনুসরণকারীর কথা ভেবেই এই সাবধানতা।

জঙ্গলের পথটা কিছুদূর পর্যন্ত পাকা, তারপর ইঁট বিছানো, সবশেষে মেটো। তবে খানা-খন্দ কমই। নির্জন পথ, পোর্শই একমাত্র গাড়ি। জানালা দিয়ে অন্ধকার জঙ্গলের ভিতর দেখবার কিছু নেই।

হঠাৎ রাস্তার ধারে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে মানসের দিকে তাকাল রানা। 'কে শুরু করবে?' কোনও ভূমিকা না করেই জিজ্ঞেস করল ও। 'আমি, না আপনি?'

এক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকল মানস। তারপর নিজের বুকে একটা আঙুল ঠেকাল। 'আমি।'

'বেশ।' রানা গম্ভীর। 'শুরু করুন।'

'দুটো কথা জানতে চাইছেন আপনি,' বলল মানস। 'এক, আমি আপনার সঙ্গে আঠার মত সেঁটে আছি কেন। দুই, আমাদের অফিস থেকে আমাকে ঠিক কী নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আপনার বদলে অন্য কোনও এসপিওনাজ এজেন্ট হলেও এই একই প্রশ্ন করত। প্রথমে আমি দ্বিতীয় প্রশ্নটার উত্তর দিই।'

'আমি অপেক্ষা করছি,' বলল রানা।

'ভারতমাতার সেবা করার নামে অনেক কাজই করতে বলা হয়েছে আমাকে,' শুরু করল মানস। 'তার মধ্যে একটা হলো উপযুক্ত সময়ে মাসুদ রানাকে খুন করা। আমার বসের এটাই পরিষ্কার নির্দেশ।'

'এই নির্দেশ আপনি কখন পেলেন?' জানতে চাইল রানা।

'কখন আবার, আপনি আমাকে ক্লজিট থেকে বের করার পর যখন ডোবার ধারে বসলাম,' বলল মানস। 'আরে মশাই, ওই তাড়াহুড়োর সময় প্রকৃতি সত্যি কাউকে ডাকে নাকি!' হাসছে ও। 'আমার কাছে ছোট্ট, অথচ অত্যন্ত শক্তিশালী রেডিও আছে।'

'আর কী নির্দেশ পেয়েছেন?' জানতে চাইল রানা।

'বিজ্ঞানী ও প্লেনটাকে ভারতে নিয়ে যেতে আমাদের দুটো টিমকে সাহায্য করতে হবে,' জানাল মানস।

'বস্‌কে নিশ্চয় কথা দিয়েছেন তাঁর সব নির্দেশই আপনি পালন করবেন?' ঠাণ্ডা সুরে জানতে চাইল রানা, মানসের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

'বোঝেনই তো, কথা না দিয়ে উপায় আছে?' নার্ভাস একটু হাসি দেখা গেল মানসের ঠোঁটে। 'বিদ্রোহ করলে ঝাড়ে-বংশে শেষ করে ফেলবে না!'

'ঠিক আছে,' কঠিন সুরে বলল রানা। 'এবার নেমে যান গাড়ি থেকে।'

কথাটা শুনে কেমন যেন হকচকিয়ে গেল মানস। তারপর

রানাকে বিব্রত করে দিয়ে নিঃশব্দে কেঁদে ফেলল। চোখ বেয়ে অঝোর ধারায় পানি গড়াচ্ছে।

রানা ভাবল, এটা যদি ওর অভিনয় হয়, আগামী অস্কারের জন্য মনোনয়ন পাওয়া উচিত ওর।

'আপনি আমাকে অবিশ্বাস করলেন?' বলল মানস। 'আমি তো কেবল একজন স্পাই নই, মানুষও!'

একটা কথাও বলছে না রানা।

'মানস ঘোষ হিন্দু হতে পারে, আপনারা যাদেরকে মালাউন বলেন, কাফের বলেন,' আবার বলল মানস, এখনও তার গাল বেয়ে পানি গড়াচ্ছে। 'কিন্তু সে বেঈমান নয়। একবার কাউকে বুক দেখালে মরে গেলেও কখনও তাকে পিঠ দেখাবে না।' গাড়ির দরজা খুলে নেমে যাচ্ছে সে।

'আপনি শান্ত হন,' বলল রানা, তার হাতে একটা রুমাল গুঁজে দিল। 'পুরুষমানুষ এভাবে কাঁদে না,' ওর কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন তিরস্কার।

কান্না থামাতে চেষ্টা করেও পারছে না মানস, স্বাভাবিক হতে আরও একটু সময় দিতে হবে ওকে।

'এখনও আপনি একটা প্রশ্নের উত্তর দেননি,' বলল রানা, নিজেকে সাবধান করতে ভুলল না যে এই লোকটা সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে ওকে– কখন কী করে বসে তার ঠিক নেই।

'জী, বলুন।' রানার দিকে তাকাচ্ছে না মানস।

'আপনি আমার সঙ্গে এভাবে আঠার মত সেঁটে আছেন কেন?' বলল রানা।

'আমার আসলে রথ দেখা আর কলা বেচা, দুটোই হচ্ছে,' চোখ মুছতে মুছতে বলল মানস। 'কপালগুণে আমি আমার মহানায়ককে পেয়ে গেছি, একটু নির্লজ্জের মত শোনালেও তাঁকে ছেড়ে যেতে আমার মন চাইছে না। আমি আসলে আপনার বন্ধু অনিল চ্যাটার্জীর সাকরেদ।'

‘অনিল?’

‘হ্যাঁ, মাসিমা ও তাঁর মুখে আপনার কথা শুনতে শুনতে কবে যে ভক্ত হয়ে গেছি নিজেও জানি না।’

‘আর কলা বেচার ব্যাপারটা? কীভাবে সারবেন সেটা?’ শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইল রানা। ‘পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে আমার খুলিতে একটা বুলেট ঢুকিয়ে?’

‘কার মাথায় বুলেট ঢোকাব সেটা সময়ই বলে দেবে,’ একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বলল মানস।

‘কিন্তু আমার তো জানা দরকার যাকে সঙ্গে নিয়ে চলছি, তার কাজটা কী, কী কারণে এতবড় একটা বিপদে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে সে,’ বলল রানা।

‘আপনাকে শুধু এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে বাংলাদেশ আর চিনের বিরুদ্ধে আমি কিছু করতে যাচ্ছি না। এর বেশি এখন যা-ই বলি না কেন, হয় অযৌক্তিক আর অবিশ্বাস্য শোনাবে, নয়তো আন্দাজে বলা হবে। আর যদি জিজ্ঞেস করেন কেন এত বড় ঝুঁকি নিতে যাচ্ছি, এর কোনও জবাব আমার আসলে জানা নেই– হতে পারে এটাই আমার নিয়তি।’

আরও কিছু শোনার অপেক্ষায় রয়েছে রানা।

একটু থেমে আবার বলল মানস, ‘জানি, আমার এই উত্তর আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারছে না, কাজেই আপনার নির্দেশ মেনে নিয়ে আমার চলে যাওয়াই উচিত। ওকে, থ্যাঙ্কিউ অ্যান্ড অল দ্যাট। গুডবাই, মিস্টার রানা। আই উইশ উই গুড লাক।’

গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে যাচ্ছে মানস।

‘ঠিক আছে, কী বলেছি ভুলে যান,’ তার কাঁধে একটা হাত রেখে বলল রানা, যদিও নিজের এই আচরণের প্রতি পুরোপুরি সমর্থন নেই ওর।

রুমালটা নিয়ে চোখ-মুখ মুছল মানস, ফোত্ ফোত্ আওয়াজ করে নাক ঝাড়ল তাতে। অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে আবার

স্বাভাবিক হয়ে গেল সে। বলল, ‘এহ্হে, এটা তো আপনাকে আর ফিরিয়ে দেয়া যাবে না। ভালই হলো, বুঝলেন না, গ্রেট মাসুদ রানার ব্যবহার করা একটা জিনিস পেলাম! ভোলাকে আপনার গন্ধ শোঁকাবার কাজেও লাগাতে পারব।’

আবার গাড়ি ছাড়ল রানা। খুব চিন্তায় আছে ও, কারণ মানসকে নিয়ে ওর দ্বিধা এখনও কাটেনি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মানস। ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে। ‘রাত বলি আর দিন, খুব ধকল যাচ্ছে,’ বলল সে। ‘বুঝলেন না।’

‘তা যাচ্ছে,’ বলল রানা, তারপর অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। ‘থাই থান্ডারের সেফ হাউস থেকে পালাবার সময় আপনার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বোধহয় ভুল করেনি,’ বলল রানা। ‘ঠিকই এক-আধজন টং গুণ্ডাকে পেয়ে গিয়েছিলেন।’

‘সত্যিই তা-ই,’ বলল মানস। ‘আসলে আমি একা তাকে পাইনি, সে-ও আমাকে পায়। দাদা তো জানেনই যে আমি আপনার মত অতটা যুদ্ধবাজ নই। কাজেই বাধ্য হয়ে আমাকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের ওপর নির্ভর করতে হয়।’

‘কী হয়েছিল তা-ই বলুন।’

‘আমি তো জানিই ওকে কাবু করতে পারব না, বুঝলেন না। সুযোগ পেলাম যখন বুঝতে পারলাম ওই ব্যাটা আমাকে জ্যান্ত ধরতে চায়। সে আসলে আমাকে দাদা ভেবেছিল! দি গ্রেট মাসুদ রানা! দি গ্রেটেস্ট এসপিওনাজ এজেন্ট অভ দ্য সেঞ্চুরি।’ হাসল মানস। ‘আমি তার ভুলটা শোধরাবার চেষ্টা করিনি, সে-ও অত বড় একজন স্পাইকে ধরতে পেরে খুব গর্ব অনুভব করল।’

‘ডক্টর নাদিরাকে কথা বলাবার জন্যে আমার সাহায্য দরকার ওদের।’

‘ঠিক তাই,’ বলল মানস। ‘ওদের চক্ষুশূল হয়ে উঠেছেন ভদ্রমহিলা। একেবারে স্পিকটি নট, মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছেন। শুনলাম যাচ্ছেতাই গালিগালাজ করছে ওরা ওঁকে,

উনিও ইংরেজি-বাংলা-চাইনিজ মিশিয়ে সমানে ওদের গুষ্টি উদ্ধার করছেন। মুশকিল হয়েছে কি জানেন, যদি মরে যান এই ভয়ে তাঁর উপর টরচার করতেও সাহস পাচ্ছে না। সেজন্যেই ওরা আপনার সাহায্যে ওঁর মুখ খোলাবার প্ল্যান করেছে।'

'তাই বুঝি?'

'বিজ্ঞানীকে নয়, টরচার করা হবে আপনাকে, আপনি যাতে কেঁদেকেটে তাঁর মুখ খোলাতে পারেন।' চেহারাটা কোঁচকাল মানস। 'সেরা হবার ল্যাঠাও কিন্তু কম নয়, বুঝলেন না!'

'ওদের ভুলটা নিশ্চয় ভাঙল একসময়?'

'ভাঙল বইকি। তবু আমাকে ছাড়ল না, আপনাকে ধরতে যদি সাহায্য হয়, তা-ই ভেবে।'

'চিয়াং মাইতে সেজন্যেই আমাকে ওরা ধরতে চেষ্টা করেছে।'

'কিন্তু, দাদা, আমাদের কথা ওরা জানল কীভাবে?' উদ্বিগ্ন হলো মানস, ছাগলদাড়ি মোচড়াচ্ছে।

'ওরা আপনার কথা জানে না। শুধু আমার কথা জানে।'

ভারতীয় সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল। 'কোথাও একটা লিক আছে,' বলল সে। 'শুধু তাই নয়, আপনি জানেন কে সে।'

'জানি না, সন্দেহ করি,' বলল রানা। 'এমন একজন, যে থাই টংকে খবর দেয় কোটা বাহারুর কোথায় পাওয়া যাবে রানা এজেন্সির লাবণীকে। তারপর কোটা বাহারু আর চিয়াং মাইয়ের পথে ঠিক কোথায় আছি আমি।'

'আচ্ছা!' উত্তেজিত হয়ে উঠল মানস। 'তা হলে সেই বেঈমান লোকটা কে হতে পারে, হুজুর– থুক্কু– মিস্টার রানা?'

'আরও নিশ্চিত না হয়ে বলতে চাইছি না,' শান্ত গলায় বলল রানা।

উঁচু-নিচু পথ। জঙ্গল কোথাও খুব ঘন, আবার কোথাও

একেবারে হালকা। মাঝে মধ্যেই পাথুরে উঁচু টিলাকে পাশ কাটাচ্ছে রানার পোর্শে। ক্রমশ পাহাড়ী এলাকায় ঢুকছে ওরা।

এক সময় জঙ্গলটার শেষ প্রান্তে পৌঁছাল গাড়ি। সামনে হাইওয়ে। নির্জন রাস্তা।

কয়েকটা মিনিট নির্বিঘ্নে পার হলো।

শুনতে পাওয়ার আগে ওটাকে দেখতে পেল রানা। পিছনের হাইওয়ে ধরে ওদেরকে ধাওয়া করে আসছে আলোর তির্যক একটা টানেল। তারপর আচমকা গুরুতর বিপদসংকেত হয়ে উঠল হেলিকপ্টারের রোটর আর ইঞ্জিনের গর্জন।

'থাই আইবি?' জিজ্ঞেস করল মানস, কাঁধের উপর দিয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে আছে।

'কী করে বলি!' দ্রুত রাস্তা ছাড়ল রানা, ঘাসের উপর দিয়ে চালিয়ে গাড়িটাকে দাঁড় করাল পাঁচ-সাতটা প্রাচীন বটগাছের ভিতর।

'আমার ধারণা, ওরাই!' বলল মানস।

'আমার খোঁজে আরও আগেই বেরোনোর কথা ওদের,' বলল রানা। মনে মনে একটা হিসাব করল– লাশটা পেতে দেরি হয়েছে, তল্লাশির আয়োজন করতে সময় লেগেছে।

'তবে এতক্ষণে খুব ভালভাবে আপনার এই গাড়ি চিনে ফেলেছে ওরা,' বলল মানস।

দ্রুতবেগে গাছগুলোর উপরে চলে এল হেলিকপ্টার। ওটার গর্জন ওদের খুলি যেন ভরাট করে তুলল। দু'এক মুহূর্তের জন্য একজোড়া গরুর গাড়ির উপর স্থির হলো আলোর বৃত্তটা, তারপর হাইওয়ের উপর দিয়ে ছুটে চলল, ধীরে ধীরে দূরে মিলিয়ে গেল যান্ত্রিক শব্দদূষণ।

অনেকটা সামনে মাথায় গাছপালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা পাহাড়, বাঁক ঘুরে সেটার আড়ালে চলে গেল কপ্টার।

'আবার ফিরে আসবে ওরা,' বলল মানস।

‘চেষ্টা করব ওদের চোখে ধরা না পড়তে, তবে যদি সম্ভব না হয়...’ কথা শেষ না করে কাঁধ ঝাঁকাল রানা, তাকিয়ে আছে ড্যাশ বোর্ডের উপর আটকানো ছোট্ট রেডিওটার দিকে। ওটার গায়ে বসানো খুদে একটা লাল আলো এই মাত্র জ্বলল।

‘আমরা ফাইট করব, মিস্টার রানা, সার?’ শিরদাঁড়া খাড়া করল মানস।

‘তা ছাড়া উপায় কী,’ বলে রেডিওটা হাতে নিল রানা। দরজা খুলছে। ‘জান বাঁচানো ফরজ।’

মাথা ঝাঁকিয়ে মৃদু হাসল মানস। ‘একজন এক্সপার্টের সঙ্গে থাকায় ভারি স্বস্তি বোধ করছি, বুঝলেন না!’

গাড়ি থেকে বেরুবার সময় হেসে উঠল রানা। ‘আপনি নিজেও কারও চেয়ে কম নন, মিস্টার মানস। তার ওপর প্রকৃতির তরফ থেকে আছে স্পেশাল একটা গিফট– ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। আমার ধারণা, ওটা আপনাকে নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে বহুবার ফিরে আসতে সাহায্য করেছে।’

‘সবই তাঁর কৃপা,’ বলে অদৃশ্য কাউকে নমস্কার করল মানস। ‘কথাটা সত্যি।’

হাতে রেডিও নিয়ে গাছগুলোর মাঝখানে চলে গেল রানা। বোতামে চাপ দিয়ে সেটটা অন করল ও। জানে বিসিআই থেকে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হচ্ছে, তবে জানে না অপরপ্রান্তে কে। দুই দেশের মধ্যে সময়ের ব্যবধান মাত্র এক ঘণ্টা, তার মানে ঢাকাতেও এখন সকাল হয়নি।

‘মাসুদ রানা।’

‘রাহাত খান,’ রানাকে চমকে দিয়ে বিসিআই চিফের ভারী গলা ভেসে এল। ‘ডক্টর নাদিরাকে পেয়েছ?’

‘দুঃখিত, সার,’ বলল রানা, ওর কাছ থেকে একটা ভাল খবরের আশায় বৃদ্ধ বস্ সারারাত জেগে অফিস করছেন বুঝতে পেরে মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠল, কারণ জানে ইদানীং তাঁর

শরীর তেমন একটা ভাল যাচ্ছে না। ‘তবে জানতে পেরেছি কোথায় আছেন তিনি।’

‘সব কথা খুলে বলো আমাকে,’ নির্দেশ দিলেন বস্।

শুরু করল রানা। কী কী ঘটছে জানাবার পর পরিস্থিতি সম্পর্কে সংক্ষেপে একটা ধারণা দিল।

‘জেটটা তা হলে শুধু রহস্য নয়, বিপজ্জনকও,’ রানাকে থামতে বললেন বিসিআই চিফ। ‘তিনদিন আগে দোই ইনথাননে আমরা একজন ইনফরমারকে পাঠিয়েছি। সে কোনও রিপোর্ট করছে না।’

‘সার, টিসিআই এজেন্ট উত্তরা বলছিল, ওদের প্রজারা অচেনা লোকজনকে ওদিকে যেতে দেখেছে, কিন্তু কাউকে ফিরতে দেখেনি।’

‘তোমাকেও আবার ওখানে যেতে হচ্ছে, কাজেই সাবধান।’

‘জী, সার।’

‘পাহাড়ের ওপর গাছপালায় আগুন লেগে যাচ্ছে,’ বিসিআই চিফ যেন স্বগতোক্তি করছেন। ‘মনে হচ্ছে মেশিন-পত্র ব্যবহার করতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলছে ওরা, সেজন্যেই ডক্টর নাদিরাকে ওদের দরকার।’

‘জী, সার,’ বলল রানা। ‘কিন্তু কী মেশিন-পত্র, সার? আমাদের দুরন্ত ঈগলে যেগুলো ফিট করা ছিল, সেগুলো নয়তো? এমন কি হতে পারে যে জিয়া এয়ারপোর্টে দুরন্তকে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলেছে ঠিকই, কিন্তু আগুন দেয়ার আগে ওটা থেকে বিশেষ কিছু মেশিন-পত্র সরিয়ে ফেলা হয়? এখন নিজেদের তৈরি একটা প্লেনে সেগুলোই ফিট করার চেষ্টা হচ্ছে, ডক্টর নাদিরার সাহায্য নিয়ে?’

রানার প্রশ্নের উত্তর যা-ই হোক, এ থেকে আরও প্রশ্ন তৈরি হবে– যেমন, কেন এমন একটা প্লেন তৈরি করা হলো যেটার গায়ে লেখা হয়েছে: **দুরন্ত ঈগল, বাংলাদেশ এয়ারফোর্স**?

‘না, তা কী করে হয়,’ ঢাকা থেকে বললেন বিসিআই চিফ। ‘দুরন্তে যে-সব মেশিন-পত্র ফিট করা ছিল, সবই বিল্ট-ইন। ওগুলো এমন ভাবে তৈরি করা হয় যাতে কেউ খুলে নিয়ে যেতে না পারে।’

রানা জানতে চাইল, ‘সেগুলো ঠিক কী ধরনের মেশিন-পত্র, সার?’

‘স্পেশাল কিছু ইকুইপমেন্ট, রানা,’ বললেন রাহাত খান। ‘দুরন্তে এমন ট্র্যাকিং কেপেবিলিটিজ ছিল, পাইলট এক হাজার মাইল রেঞ্জের মধ্যে সব কিছু দেখতে পাবে– অন্যেরা যেখানে চারশো মাইলের বেশি রেঞ্জ হলে দেখতে পায় না।’

‘অপারেটিং সিস্টেম, সার?’

‘সব কিছু ন্যানো টেকনলজির সাহায্যে তৈরি কমপিউটার অপারেট করে– আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। ডিফেন্সের জন্যে নেটওঅর্কড্ লেযার উইপন, যেটা কোথায় আঘাত হানবে নিজে থেকেই তার ছক তৈরি করতে পারে। স্পাইং ও অ্যান্টি-ওঅর টেকনলজিতে বিপ্লব ঘটিয়ে দিতে যাচ্ছে ডক্টর নাদিরার এ-সব আবিষ্কার। অন্য কেউ তাঁর কাছাকাছিও পৌঁছাতে পারেনি।’

‘সার,’ বস্ থামতে বলল রানা, ‘আমার ধারণা, দোই ইনথানন পাহাড়ে বারবার আগুন লাগার জন্যে লেযারই দায়ী।’

‘তা হলে ওটা ওদের নিজেদের লেযার যন্ত্র,’ বললেন বিসিআই চিফ। ‘নিজেরা ফিট করতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলছিল, তাই ডক্টর নাদিরাকে ধরে নিয়ে গেছে ফিট করাবে বলে।’

মনে মনে রহস্যটা মেলাবার চেষ্টা করছে রানা। ধরা যাক, ওদের প্রতিপক্ষ জানত ডক্টর নাদিরা দুরন্ত ঈগলকে ডেভেলাপ করেছেন কোনও রকম ডিজাইন ছাড়াই– ডিজাইন যদি কোথাও থেকে থাকে তো সে-সব শুধু তাঁর মাথাতে আছে। তারা প্ল্যান করল, ডক্টর নাদিরাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাবে, তারপর

তাঁকে দিয়ে নিজেদের জন্য একটা দুরন্ত ঈগল তৈরি করাবে।

ঠিক তাই করাচ্ছে ওরা।

ঢাকায় দুরন্ত ঈগলকে পোড়ানো হলো কেন? কারণ, চিন বা আর কেউ যাতে এই নতুন টেকনলজি ব্যবহার করতে না পারে।

রানা চিন্তিত। কোথায় যেন একটা অসঙ্গতি থেকে যাচ্ছে, মনটা খুঁতখুঁত করবার সেটাই কি কারণ? কী যেন ঠিক মিলছে না।

'রানা?'

চমকে উঠে রানা বলল, 'ইয়েস, সার!'

'তুমি জানো তিনি এখন কোথায়,' ভারি গলায় বললেন রাহাত খান। 'কাজেই কাজটা এখন অনেক সহজ হয়ে গেছে। তাঁকে আমাদের দরকার।'

'জী, সার।'

'তা হলে এত চিন্তা করছ কেন?' ক্ষীণ হলেও বসের কণ্ঠে তিরস্কারের সুরটা স্পষ্ট। 'যেভাবেই হোক তাঁকে ওখান থেকে বের করে আনো। সুস্থ অবস্থায়। এখানে তাঁর অনেক কাজ। নতুন একটা দুরন্ত বানাব আমরা।'

'জী, সার,' বলল রানা। বস্ রাত জেগে অফিসে বসে আছেন, এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে অ্যাসাইনমেন্টটাকে কী রকম গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছেন তিনি।

'আমরা কতটুকু কী করতে পারব, তুমি জানো,' বললেন চিফ। 'তোমাকে সাহায্য করার জন্যে থাইল্যান্ডে সৈন্য পাঠাবার সাধ বা সাধ্য, কিছুই নেই আমাদের।'

'জী।'

'তবে যেখান থেকেই সাহায্য পাওয়া যায়, নেবে,' বললেন রাহাত খান।

অপেক্ষা করছে রানা।

'চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিস সম্পর্কে নতুন করে আমার কিছু

বলার নেই তোমাকে। ওদেরকে আমি উপযাচক হয়ে কিছু করতে নিষেধ করে দিয়েছি। লিউ ফুচুংকে বলেছি, সাহায্যের প্রয়োজন হলে তুমিই ওকে জানাবে। আমি চাই তোমার কাজের স্বাধীনতা যেন বিঘ্নিত না হয়।'

'জী, সার।'

'গুড লাক, মাই বয়।' যোগাযোগ কেটে দিলেন বিসিআই চিফ।

গাড়ির কাছে ফিরে আসছে রানা।

হাতঘড়ির খুদে একটা বোতামে চাপ দিল মানস। মুখ তুলল, রানার প্রতিটি নড়াচড়া দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করছে সে।

ড্রাইভিং সিটে বসে স্টার্ট দিল রানা, আড়চোখে তাকিয়ে দেখে নিল মানসের হাতঘড়িটা। হাইওয়েতে উঠে এল গাড়ি।

'মহাশয় কিন্তু প্রচুর সময় নিলেন,' এক সময় নীরবতা ভেঙে মন্তব্য করল মানস। 'রিপোর্ট করলেন বুঝি?' তার মুখে সবজান্তার হাসি।

'হ্যাঁ,' বলল রানা।

'নিশ্চয়ই নতুন কোনও নির্দেশ পেয়েছেন,' বিড়বিড় করল মানস। 'প্লেনটা ধ্বংস করে ফেলতে হবে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'নির্দেশ সেই একটাই, বিজ্ঞানীকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তবে ধ্বংস করার আগে জেটটাকে একবার দেখতে চাই আমি। চেষ্টা করব ইন্টিরিয়ার-এর ফটো তোলার। জানা দরকার কী টেকনলজি ডেভেলাপ করল ওরা।'

'আচ্ছা। হ্যাঁ।' চিন্তিত হলো মানস। 'আসলে একই সঙ্গে দুটো অ্যাসাইনমেন্ট। সফল হওয়া অত্যন্ত কঠিন।'

হাসল রানা। 'সফল হতে চাইলে কোনও বাধাই কঠিন নয়, শুধু দেখতে হবে চাওয়াটা কতখানি প্রবল।'

মাথা ঝাঁকাল মানস। বুঝতে পারছে সে। কায়মনোবাক্যে সফল হতে চাওয়াটাই যে-কোনও ভাল এজেন্টের সবচেয়ে বড়

গুণ।

দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে মানস। এই মাত্র নিয়মিত রুটিন রিপোর্ট পাঠাবার সময় নতুন দিল্লি থেকে তাকে জানানো হয়েছে– রানা আর তার জন্য দোই ইনথানন পাহাড়ের কাছাকাছি কোথাও ফাঁদ পাতার প্রস্তুতি নিচ্ছে পিসিআই এজেন্টরা। ওদের কাজ, এই পথ দিয়ে কেউ যাতে থাই টং-এর আস্তানার দিকে যেতে না পারে সেটা নিশ্চিত করা। যেভাবেই হোক এখন ওরা জানে রানার সঙ্গে মানস ঘোষ নামে ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের একজন এজেন্ট আছে।

এই তথ্যের সঙ্গে ব্যাক-আপ প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করা হয়েছে– উদয় চ্যাটার্জি দোই ইনথানন দুর্গ এলাকা পেনিট্রেট করতে না পারলে মাসুদ রানার সঙ্গে আঠার মত সেঁটে থাকতে হবে মানসকে। তখন ওর উপরই বর্তাবে অ্যাসাইনমেন্ট সফল করবার সমস্ত দায়িত্ব, যে-কোনও মূল্যে ডক্টর নাদিরা আর দুরন্ত ঈগলকে রানা ও চিনাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে।

দিল্লি আরও জানিয়েছে, ভোলার খাবার রাখা আছে সামনের একটা মন্দিরে।

হেডঅফিস থেকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই কাজে চেষ্টার কোনও ত্রুটি বরদাশত করা হবে না।

মানস ভাবছে, রানাকে ওর খুন করতে হবে কি হবে না সেটা স্থির করবার সময় এখনও আসেনি। উদয় আগে দুর্গ পেনিট্রেট করতে ব্যর্থ হোক, সমস্যাটা তখন সমাধান করবার প্রশ্ন উঠবে।

ওর মাথায় এখন একটাই চিন্তা, একার চেষ্টায় কীভাবে পাকিস্তানীদের হামলা ঠেকাবে ও! নিজেকে বোঝাল, হাতে এখনও প্রচুর সময় আছে, আশা করা যায় কিছু একটা বুদ্ধি ঠিকই পেয়ে যাবে।

রাতটা নিঃশব্দে পার হয়ে যাচ্ছে। চাঁদ ডুবে গেলেও, আকাশ জুড়ে মিটমিট করছে অসংখ্য তারা। বাতাস আছে, ছেঁড়া

ছেঁড়া কিছু মেঘকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে পশ্চিম দিকে।

আবার দেখা গেল আলোর টানেল। এবার ওদের সামনে থেকে এল। বোধহয় সেই আগের কপ্টারটাই, হাইওয়ের উপর দিয়ে দ্রুতবেগে ছুটে আসছে পোর্শের দিকে। মানসের হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে ওঠাটা অনুভব করল রানা।

'ওরা ফিরে এসেছে,' হিন্দিতে বলল সে, প্রায় অস্ফুটে।

শুধু হাইওয়ে নয়, পোর্শের খোঁজে দু'পাশের ঘাসজমির উপরও স্পটলাইটের আলো ফেলা হচ্ছে। এবার লুকাবার কোনও জায়গা নেই ওদের– কাছাকাছি কোনও গাছপালা দেখা যাচ্ছে না। হাইওয়ের একদিকে পাহাড়-প্রাচীর, আরেকদিকে গভীর, কালো খাদ।

চাপ দিয়ে একসেলারেটর মেঝেতে দাবাল রানা। 'শক্ত হয়ে বসুন,' বলল ও।

'জো হুকুম, জাঁহাপনা!' নড়েচড়ে বসল মানস, উত্তেজনায় অধীর।

ড্যাশবোর্ডে সবুজ পান্নার মত জ্বলজ্বল করছে একটা বোতাম, সেটা স্পর্শ করল রানা। টার্বোজেট-এর জি-ফোর্স পোর্শকে সামনের দিকে হ্যাঁচকা টান দিতে সিটের পিছনে বাড়ি খেল ওদের পিঠ। চোখের পলকে স্পটলাইটের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে এল পোর্শ, সেই সঙ্গে পিছনে ফেলে এল মাথার উপর বনবন করে ঘোরা রোটরকে।

'এত দ্রুত, মিস্টার রানা? ওরা বোধহয় আমাদেরকে দেখতেও পেল না!'

দীর্ঘ একটা বাঁক ঘুরছে পোর্শ, তীক্ষ্ণ শব্দে প্রতিবাদ জানাচ্ছে টায়ার। রিয়ারভিউ মিররে চোখ রাখল রানা। হেলিকপ্টার স্থির হলো, স্পটলাইটের আলো ফেলে জায়গাটা দেখে নিল, ঠিক যেখানে ছিল পোর্শ।

গাড়ির মেঝেতে পা, আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ ধরে পোর্শকে

ছোটাচ্ছে রানা। পাশ কাটাবার সময় পাথরের স্তূপ, বোল্ডার ও কাঁটাঝোপকে ঝাপসা লাগছে।

উল্টোদিক থেকে মাঝে-মধ্যে একটা-দুটো গাড়ি আসছে, আরোহীরা বেশিরভাগই প্রতিবেশী দেশের পর্যটক, উন্মত্ত পোর্শকে তীরবেগে পাশ কাটতে দেখে ড্রাইভাররা একটানা হর্ন বাজাচ্ছে আর জানালার সামনে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করছে।

'আমরা যাচ্ছি কোথায়?' হঠাৎ জানতে চাইল মানস। সুন্দরী ও ক্লান্ত এক ড্রাইভারকে দেখবার জন্য ঘাড় ফেরাল সে, পোর্শের পাগলামি দেখে রাগে জ্বলজ্বল করছে চোখ-মুখ।

'হাইওয়ে থেকে বেশি দূরে নয় গ্রামটা,' বলল রানা। 'আর দশ-বারো মিনিট লাগবে। তারপর গাড়িটা কোথাও লুকিয়ে রেখে পাহাড়ে উঠে যাব, যেখান থেকে জেটটা প্রথমে দেখা গেছে।'

'তা হলে আমি এত চিন্তা না করলেও পারি, বুঝলেন না,' বলল মানস। 'থাই টং বেশ কিছুক্ষণ বিভ্রান্তিতে ভুগবে। কী একখানা অটোমোবাইল! আর ড্রাইভারটাও ওস্তাদোঁ কা ওস্তাদ!'

'আর দুর্দান্ত প্যাসেঞ্জারটার কথা বলছেন না যে, যার চোখের পাতা পর্যন্ত কাঁপছে না এসব দেখে? ইউ নো হোয়াট টু এক্সপেক্ট; নো ডাউট ইউ মাস্ট বি আ গুড স্পাই।'

'কিছু যদি মনে না করেন, ওই পাহাড় থেকে কে দেখেছিল প্লেনটা?' জানতে চাইল মানস। 'আপনি?'

'না,' বলল রানা। 'দেখেছিল ইমরুল কায়েস, আমাদের ব্যাংকক শাখার প্রধান–যাকে খুন করেছে টং।' দুটো নয়, এক অর্থে তিনটে অ্যাসাইনমেন্টে কাজ করছি আমি, ভাবল রানা। কায়েস হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যারা সরাসরি জড়িত তাদের সবার উপর প্রতিশোধ নিতে হবে আমাকে।

'দুঃখিত।'

সামনের রাস্তা ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে। ছোট একটা

পাহাড়ের চূড়ায় হেডলাইটের আলো পড়ল। আকাশে শিং ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্থির ছবির মত একটা হরিণ, নাকটা এমনভাবে উঁচু করা যেন নক্ষত্রের ঘ্রাণ নিচ্ছে।

'ভারি সুন্দর দেশ,' মন্তব্য করল মানস। 'সেজন্যেই ট্যুরিস্টদের এত ভিড় এখানে।'

রাস্তাটা আবার ঢালু হয়ে নীচের উপত্যকায় নেমে গেছে। লম্বা একটা লেকের চারপাশে নারকেল আর সুপারি গাছের সারি দেখতে পেল ওরা, মাঝখানে নীলচে বেগুনি পানি। আরও দূরে সাদা চুনকাম করা কয়েকটা কুঁড়ে দেখা যাচ্ছে।

সামনে একজোড়া উজ্জ্বল হেডলাইট। দুটোই কাছে চলে আসছে দ্রুত। মাঝখানের ফাঁক সামান্য কম-বেশি হচ্ছে। দুটো মোটরসাইকেল। সরাসরি পোর্শকে লক্ষ্য করে ছুটে আসছে।

'মহাশয় কিছু বলছেন না কেন? সামনে ওগুলো কী?' জানতে চাইল মানস।

'বিপদ,' রানার গলায় কঠিন সুর।

রিয়ারভিউ মিররে আবার থাই আইবি-র হেলিকপ্টারের স্পটলাইট দেখতে পেল রানা। এই মুহূর্তে ঢাল বেয়ে উপরে উঠছে পোর্শ। সামনে, জোড়া মোটরসাইকেলের পিছনে, একই স্পিডে ছুটে আসছে একটা গাড়িও।

'ওস্তাদ যদি দয়া করে অনুমতি দেন,' বলে ড্যাশবোর্ডের বোতাম লক্ষ্য করে আঙুল তাক করল মানস।

'প্লিজ।'

পোর্শের ড্যাশবোর্ডে চৌকো স্ক্রিন বেরিয়ে এল, লম্বা-চওড়ায় পাঁচ ইঞ্চি, অন্ধকার গাড়ির ভিতরটা ভরিয়ে তুলল উজ্জ্বল আভায়। মাসুদ রানার ব্যবহারের জন্য লিউ ফুচুঙের উপহার দেয়া পোর্শ অ্যাকশনে যাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ তৈরি এখন।

এগারো

সামনের জোড়া মোটরসাইকেল থেকে শুরু হলো বিপজ্জনক গানফায়ার, অন্ধকারে রাতের গায়ে লাল ও সোনালি আলোর রেখা তৈরি করে ছুটে আসছে বুলেটগুলো। কিছু বুলেট পোর্শকে পাশ কাটিয়ে গেল, কিছু বুলেটপ্রুফ আবরণে লেগে ভোঁতা আওয়াজ তুলল, অথবা পিছলে চলে গেল আরেক দিকে।

'কী করতে হবে বলে দিন,' তাগাদা দিল মানস, ড্যাশে বেরিয়ে আসা কমপিউটার অপশনগুলোর উপর চোখ বুলাচ্ছে।

'অপেক্ষা,' বলল রানা।

'তথাস্তু,' বলে হাত দুটো বুকে ভাঁজ করে সিটে হেলান দিল মানস।

ওদের পিছন থেকে দ্রুত কাছে চলে আসছে হেলিকপ্টার, যদিও এখন পর্যন্ত ওটার স্পটলাইট পোর্শকে খুঁজে পায়নি। প্রকাণ্ড যান্ত্রিক ফড়িংও হঠাৎ গুলি চালাতে শুরু করল। তবে বিরতি নিয়ে, আন্দাজে গুলি করছে গানার।

সামনে ও পিছন, দু'দিক থেকে আক্রান্ত হলো ওরা। কপ্টারের গানার টার্গেট দেখতে পাচ্ছে না, বেশিরভাগ বুলেটই পোর্শের আশপাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। যা-ও বা দু'চারটে

লাগছে, গাড়ির তাতে কোনও ক্ষতি হচ্ছে না। রানার জানামতে গাড়িটাকে বুলেটপ্রুফ করতে চিন সরকারের খরচ পড়েছে দশ লক্ষ মার্কিন ডলার।

অবশেষে কপ্টারের স্পটলাইট পেয়ে গেল পোর্শকে। দূরত্ব কমিয়ে আনার ফাঁকে বিরতিহীন গুলি ছুঁড়তে শুরু করল গানার।

'পোর্ট এবং স্টারবোর্ড,' মানসকে নির্দেশ দিল রানা। 'শিল্ড।'

কমপিউটার কমান্ড-এর পাশে রুপালি রঙের চৌকো ঘরে চাপ দিল ভারতীয় এজেন্ট। পোর্শের কন্ট্রোল সামান্য কেঁপে উঠল, কারণ হুইলগুলোর উপর ফেনডার উঁচু হওয়ায় আর সাবমেশিন গান লম্বা হওয়ায় বাতাসের তীব্র ধাক্কা লেগেছে ওগুলোয়। ড্যাশে উদয় হলো চারটে ক্রস-হেয়ার।

সামনের মোটরসাইকেল দুটো কাছে চলে আসছে, সরাসরি নাক বরাবর পোর্শের দিকে তাক করা।

'ওস্তাদ!' একটা ঢোক গিলে তাগাদা দিল মানস, তারপর অদৃশ্য কারও উদ্দেশে বুকের কাছে হাতজোড় করল।

'ক্রস-হেয়ারে চোখ রাখুন,' নির্দেশ দিল রানা। 'ওখানে কিছু পেলে চাপ দিন ফায়ার-এ।'

'জেমস বন্ড,' বিড়বিড় করল মানস আপন মনে, ড্যাশ-এ আটকে রাখল দৃষ্টি। 'এটাই বোধহয় সবদিক থেকে ভাল, কী ঘটতে যাচ্ছে আমি তা দেখলামই না।'

জোড়া মোটরসাইকেল পরস্পরের কাছাকাছি রয়েছে, ছুটে আসছে একই গতিতে। ফায়ারিং বন্ধ করেছে ড্রাইভাররা, যে যার মেশিনের উপর প্রায় বুক ঠেকিয়ে ঝুঁকে আছে। তারার আলোয় ওদের মাথার সাদা হেলমেট চকচক করতে দেখল রানা।

ড্রাইভাররা চাইছে ভয় পেয়ে রাস্তা ছেড়ে সরে যাবে রানা– হয় খাদের নীচে লেকে পড়ে ডুবে যাবে গাড়ি, নয়তো পাহাড়-প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে বিস্ফোরিত হবে ফুয়েল ট্যাংক।

মুখোমুখি সংঘর্ষের এই পরিস্থিতিতে প্রথমে যে পক্ষ ইতস্তত করে, সাধারণত তারই পরাজয় ঘটে। এক মুহূর্তের সিদ্ধান্ত-হীনতাই এখানে সূত্র, প্রতিপক্ষ ওটার জন্যই অপেক্ষা করে। সে যদি একটু আভাস পায় যে প্রতিপক্ষ পজিশন ধরে রাখতে পারছে না, সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নেয় তার নিজের নার্ভ বেশি শক্ত। এরপর কেউ তাকে নড়াতে পারবে না, কারণ সে জানে, সে-ই জিতবে।

পোর্শকে এক লাইনে স্থির রাখল রানা। গাড়িটাকে ইতিমধ্যে চেনা হয়ে গেছে তার, ওটার শক্তি ও সামর্থ্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখে।

সরু হাইওয়ের একশো গজ সামনে জোড়া মোটরসাইকেল।

ষাট গজ।

ডানদিকের মোটরসাইকেল নড়ে গেল, পরক্ষণেই আবার ফিরে এল আগের পজিশনে।

চল্লিশ গজ।

হাইওয়ের ঠিক মাঝখানে থাকছে রানা, পোর্শের উপর আস্থা রাখছে।

আর বিশ গজ।

চোখ তুলে তাকাল মানস। 'ওস্তাদ! আপ নে তো মার ডালা!' দ্রুত চোখ নামিয়ে আবার ড্যাশবোর্ডে তাকাল সে।

বামদিকের মোটরসাইকেল দৃঢ়ভঙ্গিতে নিজের পথে এখনও স্থির।

স্টিয়ারিং হুইল আঁকড়ে ধরল রানা।

ডানদিকের মোটরসাইকেলটা লাইন থেকে সরতে গিয়েও আবার ফিরে এল আগের জায়গায়। চিনতে পারল রানা—হোটেল ময়ূরীর পার্কিং গ্যারেজে যে দুই প্রকাণ্ডদেহী যমজকে ফাঁকি দিয়েছে ও, ওরাই চালাচ্ছে মোটরসাইকেল দুটো।

'ফায়ার!' শান্ত রানার কণ্ঠস্বর।

পোর্শের সাবমেশিন গান খেঁকিয়ে উঠল।

বামদিকের মোটরসাইকেল কাত হয়ে শুয়ে পড়ল রাস্তার উপর। গুলি খেয়েছে দ্বিতীয়জনও। পোর্শের ফ্রন্ট শিল্ডে আছড়ে পড়ল ওর দ্বিচক্রযান, চোখের পলকে লাফ দিয়ে উঠে গেল শূন্যে, রানা ও মানসের মাথার উপর দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে হারিয়ে গেল পিছনদিকে। কেঁপে উঠল পোর্শ, তারপর কাত হয়ে পড়ে থাকা মোটরসাইকেলটাকে অনায়াসে ডিঙিয়ে ছুটল নিজের পথে।

পোর্শের পিছনে, হাইওয়ের উপর, লাল ও কমলা আগুনের দুটো প্রকাণ্ড বল বিস্ফোরিত হলো। মোটরসাইকেল দুটো পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। ড্রাইভাররা মারা গেছে আগেই।

সামনের দৃশ্য দেখার পরও গতি কমাল না টিআইবি কার। একই গতিতে ছুটে আসছে। হেলিকপ্টার থেকে আবারও গুলি শুরু করল গানার।

গাড়ির মেঝেতে পা চেপে ধরল রানা। উপত্যকার শেষপ্রান্তে চলে আসছে ওরা। সামনের রাস্তা বাঁক নিয়ে পাহাড়ের কাঁধের আড়ালে হারিয়ে গেছে।

অকস্মাৎ থাই আইবি-র কারের চাকা পিছলাতে শুরু করল, রাস্তার উপর আড়াআড়ি হলো ওটা, পোর্শের সামনের পথে দুর্লঙ্ঘ্য পাঁচিল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

পোর্শের উপর দিয়ে উড়ে গেল হেলিকপ্টার, গতি কমিয়ে এনে আইবি-র কারের উপর স্থির হলো, ওটাকে যেন পাহারা দিচ্ছে।

হুড়মুড় করে চারজন লোক নামল গাড়িটা থেকে, প্রত্যেকের হাতে একে-ফোরটিসেভেন, রাস্তার দু'পাশে পজিশন নিচ্ছে।

অস্ফুট কণ্ঠে আপন মনে প্রশ্ন করল রানা, 'ফাঁকে কি যথেষ্ট জায়গা পাওয়া যাবে?'

'জানি না।'

'দু'পাশে রাস্তা মোটেও চওড়া নয়।'

ছুটে চলেছে পোর্শ। রাস্তা বরাবর পজিশন নিয়ে হাতের অস্ত্র

তাক করল চার থাই আইবি-র এজেন্ট।

'ওদের টার্গেট,' জিজ্ঞেস করল রানা, 'আমাদের টায়ার?'

'সম্ভবত।'

উপত্যকার মাথা থেকে উড়ে এল আরেকটা হেলিকপ্টার, ওটার স্পটলাইট দ্বিতীয় স্পটলাইটের সঙ্গে যোগ দিয়ে চোখ ধাঁধানো আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দিচ্ছে পোর্শকে।

'একটা অসম যুদ্ধ হতে যাচ্ছে,' মন্তব্য করল মানস, তারপর বলল, 'আপনি বললে আমি হাল ছেড়ে দিতে রাজি আছি।'

'টায়ারগুলোকে বাঁচানোর জন্যে বিশেষ কিছু করার নেই,' বলল রানা, পোর্শের স্পিড কমিয়ে আনছে। মানসের কথা বোধহয় শুনতে পায়নি। 'তবে আমি চাই না ওদের একটা কপ্টার আমাদের মাথার ওপর ল্যান্ড করুক। ভাল করে দেখুন তো, আর কারও আহত হবার ভয় আছে কি না।'

দুজনেই ওরা উপত্যকার চারদিকটা চোখ বুলিয়ে দেখে নিল। না, আশপাশে আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। রানার সামনে কোনও বিকল্প নেই, মিশন কমপ্লিট করতে হলে থাই এজেন্টদেরকে পাশ কাটিয়ে সামনে এগোতে হবে ওকে। অর্থাৎ ওদেরকে নিশ্চিহ্ন না করে উপায় নেই ওর।

'এস্কেপ?' ফিসফিস করল মানস।

'এস্কেপ,' বলল রানা।

চৌকো ঘরে চাপ দিল ভারতীয় এজেন্ট। ড্যাশ থেকে নতুন আলো বিচ্ছুরিত হলো। রাস্তা কতটুকু ঢালু, রাস্তার পাশে ঘাসজমির পরিমাণ, বাতাসের তাপমাত্রা ও গতিবেগ, আশপাশের এলাকার বিভিন্ন জিনিস থেকে বেরিয়ে আসা উত্তাপ ইত্যাদির রিডিং দেখা যাচ্ছে আলোকিত নতুন ডায়ালগুলোয়। আরও কিছু রিডিং চলে এল স্ক্রিনে।

– হেলিকপ্টার এক: দুজন আরোহী।

– হেলিকপ্টার দুই: একজন আরোহী।

– অটোমোবাইল: খালি।

– পুবদিকে দুজন লোক: একে-ফোরটিসেভেন।

– পশ্চিমদিকে দুজন লোক: একে-ফোরটিসেভেন।

– নিশ্চিত করো: হিসাব মেলে?

মিটমিট করা চৌকো দাগে চাপ দিল মানস।

স্ক্রিনে প্রশ্ন ফুটল: **চাও ধ্বংস করি?**

রানার দিকে তাকাল মানস। চোখ-মুখ থমথম করছে, মাথা ঝাঁকাল রানা।

চৌকো দাগে চাপ দিল মানস।

স্ক্রিনে ফুটল: **গাড়ির স্পিড হওয়া চাই ঘণ্টায় একশো পনের কিলোমিটার।**

'কাজ হবে, ওস্তাদ?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল মানস।

'আমিও দেখার অপেক্ষায় আছি,' হিসহিস করে বলল রানা। গাড়ির স্পিড আবার বাড়াল ও, ঘণ্টায় একশো পনেরো কিলোমিটারে তুলে আনল।

ঝাপসা উপত্যকা পিছিয়ে যাচ্ছে। রাস্তার ধারে হাঁটু গেড়ে থাকা থাই আইবি-র এজেন্টরা লক্ষ্যস্থির করে গুলি চালাচ্ছে।

স্পটলাইটের আলোয় উদ্ভাসিত পোর্শের গায়ে আঘাত করছে বুলেটগুলো। হঠাৎ সরলরেখা ত্যাগ করল ওটা।

রাস্তার মাঝখানটা ব্লক করে রেখেছে থাই আইবি-র কার। ওটার একপাশে নীলচে বেগুনি লেকের বিস্তার। আরেকপাশে নিচু, সমতল জলাভূমি। পোর্শকে ওই জলার দিকে তাক করল রানা।

দুজন থাই আইবি-র এজেন্ট লাফ দিয়ে সরে গেল।

কমপিউটারের নির্দেশে পোর্শ থেকে শুরু হলো গুলিবর্ষণ। যেন বুলেট নয়, হোসপাইপ থেকে বেরুনো পানির অবিচ্ছিন্ন ধারা অপর দুই থাই আইবি-র এজেন্টকে ধাক্কা দিয়ে তুলে ফেলল শূন্যে, পরিণত করল উড়ন্ত মিসাইলে।

যে দুজন পালাচ্ছিল, পিঠে ঝাঁক ঝাঁক বুলেট লাগায় অকস্মাৎ বেড়ে গেল তাদের গতি, রাস্তার কিনারা থেকে নীচের জলাভূমিতে ছিটকে পড়ল তারা।

হঠাৎ আবার গর্জে উঠল দুই হেলিকপ্টারের সাবমেশিন গান। দুটোর একটা আইবি কারের মাথার পাশে শূন্যে স্থির হয়ে ছিল, পোর্শের পথ আটকাবার জন্য ধীরে ধীরে নীচে নামতে শুরু করল সেটা।

গাড়ি আরেকটু ঘোরাল রানা, নামতে শুরু করা কপ্টারের ল্যান্ডিং প্রপ দুটোর মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে যেতে চায়। কপ্টারের স্কিডগুলো আঁচড় কাটল পোর্শের ছাতে, যেন কালো ব্ল্যাকবোর্ডে নখ ঘষছে কেউ।

'মাইরি বলছি, কী ড্রাইভিং!' মানস বিস্ময়ে অভিভূত।

পোর্শের কমপিউটার পিছন দিকে এক ঝাঁক বুলেট ছুঁড়ল, আইবি কারের গ্যাস ট্যাঙ্ককে টার্গেট করে। কমলা শিখা বিস্ফোরিত হলো, বেশ কিছুদূর আলোকিত হয়ে উঠল উপত্যকা, নগ্ন ও কংকালসার লাগল দূরের গাছগুলোকে।

সামনে আর কোনও বাধা নেই, বাড়তি গতি নিয়ে ছুটে চলল পোর্শে। উপত্যকার শেষ মাথা কাছে চলে আসছে, শুরু হতে যাচ্ছে দোই ইনথানন পাহাড়শ্রেণী।

রানার দিকে তাকাল মানস। তার জ্রতে ঘাম জমে আছে। সারা মুখে স্বস্তির হাসি।

'এখনও আমরা নিরাপদ নই,' তাকে সাবধান করল রানা।

ওদের পিছু নিয়ে ছুটে আসছে হেলিকপ্টারের ঘুরন্ত ব্লেড।

– শেষ?

বিনয়ের সঙ্গে জানতে চাইল কমপিউটার।

রুপালি ঘরে আঙুলের চাপ দিল মানস, ওটায় লেখা রয়েছে– **না**।

'ঠিক আছে তো, ওস্তাদ?' জিজ্ঞেস করল মানস।

'হ্যাঁ, ঠিক আছে,' গম্ভীর সুরে বলল রানা।

একটা কপ্টার দ্রুতগতি পোর্শের পাশে চলে এসেছে, ওটার সঙ্গে একই স্পিডে ছুটছে, ওদের মাথা থেকে ষাট কি সত্তর ফুট উঁচুতে। দ্বিতীয় কপ্টারটা পজিশন নিয়েছে সরাসরি পোর্শের মাথার উপর। কমপিউটার তার স্ক্রিনে দুটোরই পজিশন জানাল, জানাল পোর্শকে লক্ষ্য করে মিনিটে কটা করে বুলেট ছুঁড়ছে ওগুলোর সাবমেশিন গান।

'এ ভারি অন্যায়,' হঠাৎ গম্ভীর সুরে বলল মানস। 'একেবারে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসেছে ওরা!'

'মানে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ওদের বুলেট কি শেষ হতে নেই!' প্রতিবাদ জানাল মানস। 'বুলেটপ্রুফ না হলে গাড়িসহ আমরা তো এতক্ষণে ছাতু হয়ে যেতাম, মিস্টার রানা!'

'হ্যাঁ, একটু বেশি সময় লাগছে। সঙ্গে করে প্রচুর অ্যামুনিশন এনেছে ওরা।'

'সে কথাই তো বলছি, সার।'

হঠাৎ করে একসেলেরেটর থেকে পা তুলে নিল রানা।

'কী ব্যাপার?' সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইল মানস।

'একটা আইডিয়া,' সংক্ষেপে বলল রানা।

নিজের সিটে নড়েচড়ে বসল ভারতীয় এজেন্ট, উত্তেজনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল চোখ-মুখ।

গাড়ির ব্রেকে চাপ দিল রানা।

– নতুন নির্দেশনা?

অপেক্ষা লেখা চৌকো দাগটা স্পর্শ করল রানা, হাইওয়ের উপর দাঁড় করিয়ে ফেলল পোর্শকে।

'আপনি আমাকে নার্ভাস করে তুলছেন,' বলল মানস, জানালা দিয়ে দেখতে পেল কপ্টার দুটো ল্যান্ড করছে–একটা ওদের সামনে, আরেকটা ওদের পিছনে।

‘আমাদের সমস্যা হলো,’ ব্যাখ্যা করছে রানা, ‘শূন্যে থাকা কোনও জিনিসকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে পারে না পোর্শ। তা ছাড়া, স্পিডও কপ্টারের চেয়ে বেশি নয়। আমি ওটার কাজ সহজ করে দিতে চাইছি।’

‘আপনার চিনা বন্ধুকে জানালে তিনি হয়তো এই ক্রটি ভবিষ্যতে মেরামত করে দেবেন,’ মন্তব্য করল মানস।

‘কী জানি, তবে এখানকার কাজ শেষ হয়ে গেলে পোর্শটা তাকে আমরা ফিরিয়ে দেব,’ জানাল রানা।

ব্রাউন সুট পরা তিনজন আই.বি এজেন্ট কপ্টার দুটো থেকে বেরিয়ে এল। ঘুরন্ত রোটর ব্লেডের ভয়ে মাথা নিচু করে আছে ওরা, ছুটে আসছে পোর্শের দিকে, হাতে একে-ফোরটিসেভেন।

লাউড হেইলারের সামনে মুখ নিয়ে থাই ভাষায় নির্দেশ দিল রানা, ‘আমাদের পথ ছাড়ো!’

ওর গলার আওয়াজ কপ্টারের গর্জনকে ছাপিয়ে উঠল।

বৃথা চেষ্টা। লোকগুলো কাঁধে অস্ত্র তুলে লক্ষ্যস্থির করছে দেখে আবার **এস্কেপ** লেখা চৌকো দাগটা স্পর্শ করল রানা। ক্লিক করে আওয়াজ বেরুল কমপিউটার থেকে, তারপর মুহূর্তের জন্য মৃদু গুঞ্জন ছড়াল।

অবিরাম গুলি করছে ওরা। সামনের কাঁচে লেগে ছিটকে দিক পালটাচ্ছে বুলেটগুলো।

পোর্শ স্থির হয়ে থাকায় কমপিউটারচালিত মেশিনগানের নড়ে ওঠাটা অনুভব করল রানা ও মানস। ওটার বিস্ফোরণ ভারী গাড়িটাকে খুব সামান্যই দোলা দিল।

মেশিনগানের ঝাঁক ঝাঁক বুলেট ছিন্নভিন্ন করে দিল থাই আইবি-র এজেন্টদের। শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেল একজনের মাথা। রক্তাক্ত মাংস ছড়িয়ে পড়ল হাইওয়ের উপর। পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে কাজ শেষ।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা, সামনের কপ্টারের পাশ দিয়ে

পথ করে নিয়ে এগোচ্ছে। রোটরের ব্লেডগুলো এখনও দ্রুতবেগে ঘুরছে, যেন টেকঅফ করবার জন্য তৈরি।

আবার নড়ে উঠল পোর্শের অস্ত্র, এবার টার্গেট করেছে যান্ত্রিক ফড়িং দুটোর গ্যাস ট্যাঙ্ক। ওদের পিছনে বিস্ফোরিত হলো কপ্টার দুটো।

আবার পাহাড়শ্রেণীর দিকে গাড়ি ছোটাল রানা, পিছনের নির্জন উপত্যকায় রেখে যাচ্ছে পাঁচটা ছোট-বড় অগ্নিকুণ্ড।

'এই যে আমি বেঁচে আছি, সেজন্যে প্রথমেই আমি আমার জননীর তরফ থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিচ্ছি, মিস্টার রানা। বিশ্বাস করুন, মহাশয়, সব কথা শোনার পর আমার জন্মদাত্রী আপনাকে আপন সন্তানের মত আশীর্বাদ করবেন।'

মানসের দিকে তাকাতে হকচকিয়ে গেল রানা। কোনও কারণ ছাড়াই তার চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠেছে।

বারো

দোই ইনথাননকে পাশ কাটিয়ে আরও পশ্চিমে চলে এল ওরা। ইতিমধ্যে ফরসা হয়ে গেছে আকাশ।

হাট খোয়াই শহরে ঢুকল না পোর্শ, ওটাকে বাম পাশে রেখে ছুটে চলল সরকারী বেস ক্যাম্পের দিকে। কাছাকাছি লেক ও নদীতে সারা রাত মাছ ধরেছে জেলেরা, এখন মাথায় ঝাঁকা নিয়ে শহরের বাজারে চলেছে তারা।

মন্দিরটা পড়ল রাস্তা যেখানে বাঁক নিতে শুরু করেছে, ছোট একটা পাহাড়ের কাঁধের উপর। রাস্তার এই অংশ থেকে প্রাচীন

বটগাছের আড়ালে মন্দিরের শুধু পিছনদিকটাই দেখা যাচ্ছে, সেখানে না আছে কোনও দরজা-জানালা, না আছে উপরে ওঠার কোনও পথ।

'এখানে কালিমন্দির?' বিস্মিত কণ্ঠে বলল মানস। কীভাবে বুঝল ওটা কালিমন্দির সে-ই জানে। হাত দুটো এক করে কপালে ঠেকাল। 'মাফ করবেন, মিস্টার রানা,' আবেদনের সুরে বলল সে, 'একটু থামবেন, প্লিজ? আমি ধর্মভীরু মানুষ। পথে মন্দির পড়লে দেবীদর্শন না করা আর নিজের পায়ে কুড়ুল মারা, একই কথা। অন্তত আমি তাই বিশ্বাস করি। কিছু একটা অমঙ্গল হবেই হবে।'

'অত যদি অমঙ্গলের ভয়,' মৃদু হেসে বলল রানা, পোর্শকে রাস্তার ধারে দাঁড় করাল। 'যান, দেবীদর্শন করে আসুন। কিন্তু এখানে যে থামতে বললেন, মন্দিরে উঠবেন কীভাবে? তারচেয়ে বাঁকটা ঘুরি, মন্দিরের সামনের দিকে নিশ্চয় সিঁড়ি আছে...'

'অসংখ্য ধন্যবাদ, মিস্টার রানা।' ড্যাশবোর্ড থেকে নিজের বিনকিউলারটা তুলে গলায় ঝোলাল মানস, দরজা খুলে গাড়ি থেকে নেমে যাচ্ছে। 'ঢালটা তেমন খাড়া নয়, উঠতে আমার কোনও অসুবিধে হবে না। এই যাব আর আসব।'

আর কিছু না বলে কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

ঢাল বেয়ে পাথুরে টিলার উপর ওঠার সময় চিন্তা করছে মানস। নতুন দিল্লির দেওয়া তথ্য যদি নির্ভুল হয়, এখন থেকে যে-কোনও মুহূর্তে ওদের উপর হামলা চালাবে পাকিস্তানীরা, অথচ এখনও সেটা ঠেকাবার কোনও বুদ্ধি বের করতে পারেনি সে।

দেবীদর্শনের ছুতোয় পাহাড়টার উঁচু কাঁধের উপর চড়ে চারদিকে একবার চোখ বুলাতে চাইছে, আশা: পাকিস্তানী অ্যাটাক টিমকে দেখতে পাবে।

তবে এমনিতেও একবার ওকে উপরে উঠতে হত, ভোলার খাবারের কৌটাগুলো রাখা আছে ওখানেই কোথাও।

যতই উপরে উঠছে মানস, ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ওকে ততই সতর্ক হওয়ার তাগিদ দিচ্ছে। চূড়ার কাছাকাছি, দেড়শো ফুটের মত উঠে এসে ঘাড় ফিরিয়ে নীচে একবার তাকাল ও। গাড়ির পিছনটা অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে শুধু। একটু পর তাও আর দেখা গেল না।

খুবই প্রাচীন একটা মন্দির, অস্বাভাবিক উঁচুও, কালের আঁচড়ে শ্যাওলা ধরা দেয়াল আঁকাবাঁকা ফাটলের সমষ্টি হয়ে দাঁড়িয়েছে। মন্দিরকে ঘিরে সরু একটা পথ গাছপালার ভিতর দিয়ে সামনের দিকে চলে গেছে। অত্যন্ত সন্তর্পণে এগোচ্ছে মানস।

মানসের কাছে কোনও আগ্নেয়াস্ত্র নেই। শুধু ছোট একটা ছুরি আছে, তবে ওর থ্রো খুব ভাল। আনআর্মড কমব্যাট শুরু হলে জুজিৎসুর প্যাঁচ কষে, জানে শুধু গায়ের জোরে পেরে উঠবে না। ওর কাছে আরও একটা জিনিস আছে, বদ্ধ কোনও জায়গায় ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। খোলা জায়গায় ভাল ফল পেতে হলে দেখে নিতে হবে, বাতাসটা শত্রুর দিকে বইছে কি না; নইলে মরতে হবে নিজেকেই।

ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে বাঁকা হয়ে এগিয়েছে সরু পথটা। মন্দিরের ডান পাশে একটা ভাঙা জানালা দেখল মানস। নিঃশব্দ পায়ে সেটার নীচে পৌঁছাল, পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে ভিতরটা দেখবার চেষ্টা করছে।

দৃশ্যটা দেখামাত্র বুকটা ধক করে উঠল মানসের। ওর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল বুড়ো এক থাইয়ের। ভাঙাচোরা একটা ঘর, হাত-পা বেঁধে মেঝেতে ফেলে রাখা হয়েছে লোকটাকে, মুখের ভিতর কাপড় গোঁজা।

চোখাচোখি হতে শরীরটাকে মোচড়াল সে, কিছু বলতেও চেষ্টা করল, তবে কোনও শব্দ বেরুল না।

নাক বরাবর সামনে কবাটবিহীন আরেকটা জানালা দেখল মানস, সেটা দিয়ে খোলা বারান্দা দেখা যাচ্ছে। চোখ ফিরিয়ে

নেবে, এই সময় বারান্দা দিয়ে হেঁটে যেতে দেখল নীল সুট পরা এক লোককে, হাতের কারবাইনটা বুকের কাছে তির্যক ভঙ্গিতে ধরা।

লোকটাকে দেখে পাকিস্তানী বলে মনে হলো মানসের, অন্ত ত চিনা কিংবা থাই নয়।

ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে জানালার কাছ থেকে সরে এল মানস। দ্রুত কাজ করছে ওর মাথা। পাকিস্তানীরা মন্দির দখল করেছে কীজন্যে? শুধু দখল করেনি, পাহারাও বসিয়েছে। কেন?

এই রাস্তা ধরে দোই ইনথানন পাহাড়ে পৌঁছানো যায়। পিসিআই এজেন্টরা জানে ওকে নিয়ে ওখানেই যাচ্ছে মাসুদ রানা। মন্দিরটা রাস্তার ধারে, অ্যামবুশ পেতে অপেক্ষা করতে হলে এর চেয়ে ভাল জায়গা আর হয় না।

সংখ্যায় ওরা কজন, একা কতটুকু কী করতে পারবে, ভাবতে ভাবতে বাঁকা পথটা ধরে সাবধানে এগোল মানস। সামনে মন্দিরের আরেকটা কোণ, খুব সাবধানে উঁকি দিয়ে তাকাল ও।

মানসের নাক সমান উঁচুতে বারান্দার মেঝে। মেঝে ধরে ওর কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে একজোড়া জুতো পরা পা। পা বেয়ে উপরে উঠল ওর দৃষ্টি। নীল সুট পরা সে-ই প্রহরী লোকটা টহল দিচ্ছে।

বারান্দার শেষ মাথায় সরু সিঁড়ি। সিঁড়ির কাছাকাছি পৌঁছে ঘুরতে যাচ্ছে লোকটা, কোণ থেকে দ্রুত মাথাটা টেনে নিল মানস। তারপর বসে পড়ল।

বারান্দার মেঝে ধরে এগিয়ে আসছে জুতোর আওয়াজ। মানসের হাতে বেরিয়ে এল ছুরিটা। কীভাবে কী করা যায় ভাবছে ও। বিদেশি লোকেরা বিনা কারণে দখল করেনি মন্দিরটা। মেঝের শেষপ্রান্তে পৌঁছে আবার ঘুরল লোকটা, সিঁড়ির দিকে ফিরে যাচ্ছে।

এবার না দাঁড়িয়ে ক্রল করে সামনে এগোল মানস। দেখা

দরকার মন্দিরের ঠিক সামনে কী আছে।

উঁচু বারান্দা যেখানে শেষ হয়েছে সেখান পৌঁছে নাক বরাবর সামনে ও নীচে তাকাতে রীতিমত চমকে উঠল মানস। কয়েকটা কাঁটাঝোপের ফাঁকে, মাত্র বিশ হাত দূরে দেখা যাচ্ছে রাস্তাটা, ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে এসেছে পাহাড়ের কাঁধে, তারপর আবার ঢাল বেয়ে নেমে গেছে।

দ্রুত কাজ করছে মানসের মাথা। হিসাব মেলাবার চেষ্টা করছে ও। দোতলায় অ্যামবুশ পাতা হয়েছে!

সিধে হলো মানস। কাঁটাঝোপের আড়াল নিয়ে বারান্দায় ওঠার ধাপগুলোর দিকে এগোল, দেখতে পাচ্ছে সিঁড়ির কাছে পৌঁছে যাচ্ছে গার্ড।

কাঁটাঝোপের আড়াল থেকে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এল মানস, ধাপ কটা বেয়ে বারান্দায় উঠছে। গার্ডও ঘোরা শেষ করে ওর দিকে তাকাল।

প্রচণ্ড বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল লোকটা। দেখল অচেনা এক লোক তাকে লক্ষ্য করে কী যেন ছুঁড়ছে। মৃদু একটা ঝাঁকি খেল সে। আরও বড় হলো তার হাঁ। চোখ নামিয়ে দেখল রুপালি হাতলটা কেবল বেরিয়ে আছে বুকের বাম দিকে, ফলার সবটুকু ভিতরে গাঁথা।

হৃৎপিণ্ড চিরে যাওয়ায় ঢলে পড়ার আগে টুঁ-শব্দ করতে পারল না লোকটা। ছুটে এসে এক হাতে তার পতন ঠেকাল মানস, আরেক হাতে ধরে ফেলল কারবাইনটা।

লাশ মেঝেতে নামিয়ে রেখে নিঃশব্দ পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে মানস। রক্ত মুছে ছুরিটা রেখে দিয়েছে আগের জায়গায়, ওর হাতে এখন কারবাইন।

সিঁড়ির মাথায় একটা দরজা, তবে তাতে কোনও কবাট নেই। দরজার কাছাকাছি পৌঁছে ফিসফাস আওয়াজ শুনতে পেল মানস, চাপা গলায় কারা যেন কথা বলছে। ভাষাটা যে পাঞ্জাবী,

তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

একজন বলল, 'মেসেজে বলা হয়েছে আর পনেরো মিনিট পর মন্দিরকে পাশ কাটাবে পোর্শ। তার জায়গায় বিশ মিনিট পার হতে চলেছে—কোথায় মাসুদ রানা আর তার মালাউন বাঁদরটা?'

মানসের গা জ্বালা করছে। তবে সেটাকে পাত্তা দিল না। কথা শুনে বোঝা গেল, এরা পিসিআই এজেন্ট।

সিঁড়ির ধাপের উপর শুয়ে পড়ল মানস, মাথাটা পৌঁছাল চৌকাঠের ঠিক নীচে। তারপর ধীরে ধীরে উঁচু করল একটা চোখ।

কামরার ভিতর আধ হাত জিভ বের করে চারজন নীল সুট পরা বিধর্মীর দিকে রক্তচক্ষু মেলে তাকিয়ে রয়েছে দেবী ভয়ঙ্করী—হিন্দুদের মা কালীর মূর্তি।

দরজার দিকে পিছন ফিরে লম্বা-চওড়া লোকগুলো দুটো জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, দুজনের হাতে দুটো গ্রেনেড লঞ্চার, বাকি দুজনের কাঁধে দুটো বাজুকা। জানালাগুলোর পাশে দেয়ালে ঠেস দেওয়া রয়েছে চারটে কারবাইন।

'মালাউন মেরে সওয়াব হাসিল করব, তা বুঝি আর হলো না,' তাদের একজন বলল। 'অ্যামবুশ টের পেয়ে শালারা বোধহয় ভেগেছে!'

চুইংগামের একটা প্যাকেট বের করল মানস, তবে প্যাকেট থেকে যেটা বেরুল সেটা চুইংগাম নয়। জিনিসটা দেখতে খুদে ক্যাপসুলের মত, ভিতরে নার্ভ গ্যাস ভরা। আঙুলের টোকা দিয়ে সেটাকে কামরার মাঝখানে ফেলল ও।

ত্রিশ সেকেন্ড পর পুট্ করে মৃদু একটা শব্দ হলো। ঝট্ করে ঘাড় ফেরাল চারজনই। অদৃশ্য গ্যাস দেখতে পায়নি তারা, শুধু দেখল দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে এক লোক অমায়িক হাসি হাসছে। 'সেলাম, হুজুর! নমস্তে! কই, আমরা তো পালাইনি!' বলল সে।

অস্ত্র ঘুরিয়ে মানসের দিকে তাক করতে চেষ্টা করল ওরা,

কিন্তু হঠাৎ সারা শরীর অবশ হয়ে যাওয়ায় ঢলে পড়ল যে যার জায়গায়। আঙুলের ছাপ মুছে কারবাইনটা ওখানেই ফেলে রাখল মানস।

গোটা মন্দির তন্নতন্ন করে খুঁজেও খাবারের কোনও কৌটা কোথাও খুঁজে পেল না ও। কিন্তু দিল্লি তাকে ভুল তথ্য দেবে, এ-ও তো হতে পারে না। মাথা ঠাণ্ডা করে এক মুহূর্ত চিন্তা করল ও। তারপর একটা মই দেখতে পেয়ে উঠে পড়ল ফল্স্ সিলিঙে।

একটা চামড়ার ব্যাগ দেখে হাসি ফুটল ওর মুখে। ব্যাগ খুলে টিনের কৌটাগুলো ভরে নিল পকেটে।

'মা কালীর আশীর্বাদ নিয়ে এলাম,' গাড়িতে ফিরে এসে বলল মানস, অমায়িক হাসিটা এখনও লেগে রয়েছে ওর মুখে।

'সন্দেহ হচ্ছে আরও কিছু করে এসেছেন কি না,' গাড়ি ছেড়ে দিয়ে বলল রানা, মানসের চোখের চকচকে ভাবটাকে স্বাভাবিকভাবে নিতে পারছে না ও। একজন খুনির চোখেই যেন মানায় ওটা।

'আপানি গুণী ব্যক্তি, জানি আন্দাজ করে অনেক কিছুই ধরে ফেলবেন,' বলে কাঁধ ঝাঁকাল মানস। 'তবে আশা করি এ-ও বুঝবেন যে আমি আসলে পুতুল, যেমনি নাচায় তেমনি নাচি। একটা রাখুন, ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে।'

রানার হাতে চুইংগামের একটা প্যাকেট ধরিয়ে দিল মানস, মন্দিরে যেটা ব্যবহার করেছে সেটার চেয়ে আকারে একটু বড়।

'কী এটা?'

'লেথাল নার্ভ গ্যাস। দেখা যায় না,' বলল মানস। 'বাতাস কোন্‌দিকে বইছে খেয়াল করে ফাটালে নিজে মারা পড়বেন না। আরও একটা জিনিস দিই,' বলে পকেটে হাত ভরল ও। 'এই নিন।' টিনের কয়েকটা কৌটা বের করে রানার কোলের উপর রাখল।

‘আর এগুলো?’

‘আমার ভোলার খাবার,’ বলল মানস। ‘আপনার হাত দিয়ে খাওয়াতে চাই, তা হলে আমার মত সে-ও আপনার ভক্ত হয়ে উঠবে।’

খানিক পর রানা খেয়াল করল, চকচকে ভাবটা মানসের চোখ থেকে মুছে গেছে। এইবার ভোলার খাবার আনতে গিয়ে মন্দিরে কী ঘটেছে খুলে বলল মানস রানাকে।

পোর্শটা লুকিয়ে রাখার জন্য পরিত্যক্ত একটা গোলাঘর পছন্দ হলো রানার, সরু একটা গিরিখাদের মুখেই সেটা। গ্রামের চারদিকে আরও কিছু খালি বাড়ি-ঘর দেখতে পেল ওরা, আগুনে পুড়ে গেছে।

প্রতিবেশী দেশের দুই এজেন্ট ঝোপ-ঝাড় ভেঙে এনে যতটা পারা যায় পোর্শকে ঢেকে ফেলল। এখানে কাপড়চোপড় পাল্টাল ওরা, সাপ্লাই ছাড়াও যে যার প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র ভরল নিজেদের ব্যাকপ্যাকে। তারপর দুর্গম ট্রেইল ধরে গিরিপথের ভিতর দিয়ে এগোল।

সরকারী বেস ক্যাম্প থেকে জায়গাটা বেশি দূরে নয়। এলাকাটা রানার পরিচিত, তাই সামনে থাকল ও।

‘এদিকটা ভারি নির্জন,’ মন্তব্য করল মানস। ‘কী শান্তি!’

‘হ্যাঁ, বিরাট রিলিফ,’ একমত হলো রানা, মানসের মত সে-ও ভাগ্যগুণে বেঁচে যাওয়ার ব্যাপারটা ভুলতে পারছে না।

‘কিছু মানুষ কত বোকা হয়, তাই না?’ তিক্ত হাসি ফুটল মানসের ঠোঁটে। ‘কী রকম অবলীলায় অন্যায়-অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে, তারপর মশা-মাছির মত মারা যায়।’

‘ওরা কিন্তু আমাকে এখন আর জ্যান্ত ধরার চেষ্টা করবে না,’ বলল রানা।

মাথা ঝাঁকাল মানস। ‘তার মানে কি ডক্টর নাদিরা গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য দিয়ে ফেলেছেন ওদেরকে?’

'তা দেবেন বলে বিশ্বাস করি না। অত্যন্ত শক্ত মানুষ উনি।'
একটা আশঙ্কার কথা ভেবে শিউরে উঠল রানা। সায়ানাইড ক্যাপসুল আছে ডক্টর নাদিরার মাড়ীতে। পরিস্থিতি সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি হলে সেটা না তিনি খেয়ে ফেলেন!

বারো শো ফুট ওঠার পর প্রথম বসতিটা দেখতে পেল ওরা। রহস্যময় আগুন লেগে যে-সব ঘর-বাড়ি পুড়ে গিয়েছিল তার কোনও চিহ্ন নেই কোথাও, নতুন করে আবার সব বানিয়ে নিয়েছে আদিবাসীরা।

দ্বিতীয় বসতিটা আঠারোশো ফুট উপরে, আকারে বেশ বড়, তবে এটায় আগুন লাগেনি।

আরও পাঁচশো ফুট উঠল ওরা। এটা আদিবাসীদের তিন নম্বর বসতি। বাড়ি-ঘরের সংখ্যা দুশোর কম নয়, সবই আবার নতুন করে তৈরি করা।

বড়সড় গোলাঘরটা দেখে উত্তরার কথা মনে পড়ে গেল রানার। এখানেই তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল মেয়েটির। ওই গোলাঘরেই একটা রাত কাটিয়েছে তারা।

এত সকালে পাখিদের ডাকাডাকি আর ছুটোছুটি খুব স্বাভাবিক, অথচ গাছের সব ডাল একেবারে খালি, একটা পাখিও দেখা যাচ্ছে না কোথাও। তারপর মনে পড়ল রানার—উত্তরা ওকে বলেছে, আবারও আগুন লেগেছে পাহাড়ের কোথাও কোথাও।

দোই ইনথাননের পাঁচ হাজার ফুটে উঠতে আরও দু'ঘণ্টা লেগে গেল ওদের।

একসময় দেখা গেল ওদের সামনে ট্রেইলের আর কোনও অস্তিত্বই নেই। জায়গাটা চিনতে পারল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাবার আগেই জানে ডানদিকে পাহাড়প্রাচীরের গায়ে একটা ফাঁক আছে। কাঁটা-ঝোপ টপকে সেদিকে এগোল ও, পিছু নিয়ে মানসও।

পঁচিশ গজ এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো। সামনে ফাঁকা জায়গা, ঝপ্ করে নেমে গেছে পাহাড়ের গা।

বিনকিউলার অ্যাডজাস্ট করল রানা। পাহাড় ঘেরা বনভূমির মাঝখানে প্রাচীন সেই বিশাল দুর্গে চোখ আটকে গেল। থাই টং-এর চিফ জিকো তানাই-এর আস্তানা ওটা। নদীর দিকে মুখ করা প্রাচীন দুর্গটা এখান থেকে অনেক দূরে।

কী কারণে বলা মুশকিল দুর্গটাকে আজ সেভাবে পাহারা দেওয়া হচ্ছে না। বিরাট ওই ফটকের সামনে দশ-বারোজন চিনাকে কারবাইন হাতে পাহারা দিতে দেখেছে রানা। আজ সেখানে মাত্র দুজন লোককে অলসভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে।

বহুদূরে পিং নদী দেখতে পেল রানা। পাঁচশো মাইল দূরে, রাজধানী ব্যাংকক হয়ে সাগরে গিয়ে মিশেছে ওই নদী।

বিনকিউলারটা মানসের হাতে ধরিয়ে দিল ও।

'কোথায় রানওয়ে?' একটু পরেই জানতে চাইল মানস। 'রানওয়ে না থাকলে প্লেন আসবে কোত্থেকে?'

উত্তরা বলেছে বটে প্লেনটা দুর্গ থেকে আবার বের করা হয়েছে, কিন্তু রানাও সেটাকে দেখতে পাচ্ছে না। তবে কিছু গাছপালার উপর চোখ পড়েছে ওর। সেদিকে মানসের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। 'ওদিকটা ভাল করে দেখে বলুন কী মনে হচ্ছে।'

'সাজানো গোছানো কয়েক সারি গাছ, যেন খুব যত্ন নেয়া হয়, বুঝলেন না,' বলল মানস।

'হ্যাঁ। পরিচ্ছন্ন, নিখুঁত কয়েকটা সারি। চারদিকের বাকি গাছপালার মধ্যে এই শৃংখলা দেখা যাচ্ছে না।'

'কেন? ও, আচ্ছা, বুঝেছি!' হেসে উঠল মানস। 'ওগুলোর ভেতরে আড়াল করা আছে রানওয়েটা, বুঝলেন না! ওগুলো হয় কৃত্রিম গাছ, না হয় কোথাও থেকে কেটে এনে বসানো হয়েছে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা, তারপর বলল, 'রানওয়েই যেখানে দেখা যাচ্ছে না, প্লেনটাকে সেখানে দেখতে না পাওয়ারই তো কথা।'

'বুঝেছি, দেখতে হলে আমাদেরকে ঢাল বেয়ে ওই উপত্যকায় নামতে হবে।'

'হ্যাঁ।'

ঠিক এই জায়গায় পাহাড়ের গা এত বেশি খাড়া যে দক্ষ পর্বতারোহীর অভিজ্ঞতা আর প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম ছাড়া নীচে নামা কারও পক্ষে সম্ভব নয়, তাই ট্রেইল ধরে প্রথমে এক হাজার ফুট পিছিয়ে এল ওরা, তারপর ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল।

ঘুরপথ ধরেছে রানা, তির্যক একটা রেখা ধরে নামছে, ফলে এখন আর পিং নদী বা দুর্গ দেখতে পাচ্ছে না।

ইতিমধ্যে চারশো ফুট নীচে নেমে এসেছে ওরা। ঢাল ধরে আরও আড়াই হাজার ফুট নামবার পর নীচের দৃশ্য দেখে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়তে হলো ওদেরকে।

আবার নদী ও দুর্গ দেখতে পাচ্ছে রানা। ওদের কাছ থেকে এখনও দু'হাজার ফুট নীচে ওগুলো। শুধু নদী ও দুর্গই নয়, এখন শুকিয়ে বাদামী হয়ে ওঠা চার সারি গাছের মাঝখানে হ্যাঙ্গার সহ রানওয়েটাও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আর দেখা যাচ্ছে চাকে ঢিল খাওয়া মৌমাছির মত বহু লোকের ব্যস্ততা।

রানা যেটাকে পুড়িয়ে দিয়েছিল ঠিক সেই জায়গাতেই নতুন আরেকটা হ্যাঙ্গার তৈরি করা হয়েছে। ওটার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে রহস্যময় সেই জেট প্লেন।

প্লেনটাকে চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে সৈন্যরা।

প্লেনটার রঙ ধূসর সবুজ। গায়ে বড় বড় হরফে লেখা : **দুরন্ত ঈগল, বাংলাদেশ এয়ারফোর্স**। এয়ারফোর্সের লোগোটাও চেনা যাচ্ছে পরিষ্কার।

জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে দুরন্ত ঈগল যদি না-ই খোয়া গিয়ে থাকে, ওটা তা হলে কী?

তবে প্রশ্নটা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই, কারণ এখনই আড়ালে সরে যেতে হবে, নইলে কারও চোখে পড়ে যেতে পারে যে-কোনও সময়। কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা হ্যাঙ্গারের এক ধারে ইউনিফর্ম পরা থাই সৈন্যদেরকে টহল দিতে দেখতে পাচ্ছে রানা। তাদের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ কিছু সৈনিকও রয়েছে। গাছপালার ফাঁকে অস্থায়ী সেনাছাউনিও চোখে পড়ল—সারি সারি তাঁবু ফেলা হয়েছে, তাঁবুর বাইরে আগুন জ্বেলে রান্নার আয়োজন চলছে।

কাঁটাতারের বাইরে, রানওয়ের পাশে কিছু প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড হাট দেখতে পেল রানা, সবুজ ও খয়েরি ক্যামুফ্লাজ রঙে রাঙানো। ওগুলো সম্ভবত থাই টং সদস্য, টিআইবি এজেন্ট আর শ্বেতাঙ্গ টেকনিশিয়ানরা ব্যবহার করছে।

রানওয়ের আরেক মাথায় তিনটে হেলিকপ্টার আর দুটো জেট প্লেন দেখতে পেল রানা। ওগুলোর গায়ে মার্কিন এয়ারফোর্স-এর মার্কা মারা।

ঈগলটা হ্যাঙ্গারের সামনে থাকলেও, রানওয়ের উপর থেকে এরইমধ্যে গাছের কাটা গুঁড়ি, কাণ্ড আর বোল্ডার একপাশে সরিয়ে রাখা হয়েছে।

'যে-কোনও মুহূর্তে উড়ে যাবে পাখি,' পাশ থেকে বলল মানস।

গম্ভীর রানা মাথা ঝাঁকাল।

প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড হাট থেকে বেরিয়ে এল দুজন শ্বেতাঙ্গ। সাদা পোশাক পরা বয়স্ক লোক, ইঞ্জিনিয়ার কিংবা পাইলট হতে পারে। দুজনের হাতেই হেলমেট দেখা যাচ্ছে, দ্রুত পায়ে কাঁটাতারের বেড়ার দিকে হাঁটছে ওরা।

নড়াচড়া লক্ষ করে আবার একটা হাট-এর দিকে তাকাল রানা। এবার সেটা থেকে বেরুল দুজন তরুণী। উত্তরা আর মোহনা— টিসিআই, অর্থাৎ, থাই কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট। দুজনের হাতই পিছমোড়া করে বাঁধা। তাদের দু'পাশে আই.বি-

র দুজন পুরুষ এজেন্টকে দেখা যাচ্ছে, ওদেরকে নিয়ে বেরিয়ে আসছে রানওয়ে থেকে।

কাঁটাতারের বেড়ার বাইরে মেটাল ওয়াল দিয়ে ঘেরা এক সারি ল্যাট্রিন রয়েছে, রানা ও মানসের সরাসরি নীচে। ওখানেই নিয়ে আসা হচ্ছে ওদের দুজনকে।

'একটা প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল,' বলল রানা।

'উত্তরা ম্যাডামকে এখানে ধরে এনেছে ওরা,' বলল মানস। 'তবে এখনও তাকে টরচার করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না।'

এই সময় দূর থেকে একটা কুকুর ডেকে উঠল। ডাক শুনেই বোঝা গেল: ডোবারম্যান পিনশার।

'আমার ভোলা!' এক গাল হেসে বলল মানস। 'নিশ্চয়ই আমার গায়ের গন্ধ পেয়েছে!'

'কোত্থেকে এল ভোলা? আশপাশে...'

'ঠিক ধরেছেন, দাদা। আমরা টের না পেলে কী হবে, কাছাকাছিই কোথাও রয়েছে ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের অপারেটররা, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে আমাদের। যাকগে, আমরা তো সেটা জানতামই।...কিন্তু দ্বিতীয় মেয়েটা কে, হুজুর, মানে, সার?'

'মোহনা, ও-ও একজন টিসিআই এজেন্ট,' বলল রানা।

'ইমরুল কায়েসের সন্তান ধারণ করছেন যিনি?' ভ্রূ কোঁচকাল মানস। 'ওঁদেরকে বন্দি করার কারণ কী হতে পারে?'

'সম্ভবত আমাকে সাহায্য করার অপরাধে,' বলল রানা।

ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল মানস। 'এবার বলুন, বস্, কীভাবে এগোব আমরা?'

নিজের প্ল্যান সম্পর্কে মানসকে একটা আভাস দিল রানা, ঘাড় ফিরিয়ে নীচের উপত্যকাটা দেখে নিল একবার।

ওর প্ল্যান সবটুকু না শুনেই মুগ্ধ মানস, অপলক চোখে রানার দিকে তাকিয়ে আছে। 'এত কিছু? তাও এরকম দিনে-

দুপুরে?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল, ঘাড় ফিরিয়ে টহলরত গার্ডদের দিকে তাকাল আরেকবার।

মানসের পিঠ চাপড়ে দিল রানা। ওর হাতে স্ট্রাইয়েটেড টেপ-এর রোল আর একটা পিস্তল ধরিয়ে দিয়ে হাসল ও, বলল, 'আপনার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়কে কাজে লাগান দেখি এবার।'

'জে-আজ্ঞে,' বলে এক গাল হাসল মানস। নিজের ব্যাকপ্যাক থেকে বের করে কুকুরের রেশন ভর্তি টিনের দুটো কৌটা ধরিয়ে দিল রানার হাতে। 'আরও দুটো রাখুন। টিনে ভরা বলে আবার ভাববেন না বাজার থেকে কেনা। নিজের হাতে তৈরি করা, মশাই। গন্ধ শুঁকেই বুঝতে পারবে ভোলা। অনেকেই বিশ্বাস করতে চায় না যে, আমার হাতের তৈরি খাবার ছাড়া অন্য কিছু খায় না ভোলা। কী করে করবে? আসলে তো খায়!' বলে লাজুক হাসি হাসল মানস ঘোষ।

তেরো

পাথুরে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ধীরে ধীরে উপত্যকায় নেমে যাচ্ছে রানা। বিপদসঙ্কুল পথ থেকে মুখ তুলে মাঝে-মধ্যেই দেখে নিচ্ছে কারও চোখে ধরা পড়ে গেল কি না, তারপর আবার তাকাল নিজের পায়ের দিকে। এক বোল্ডার থেকে আরেক বোল্ডারে গা ঢাকা দিয়ে নামছে, যেখানে সম্ভব গাছ ও ঝোপের আড়াল নিচ্ছে।

রানার কাছ থেকে ত্রিশ ফুট ডানে রয়েছে মানস, অন্য একটা পথ ধরে সে-ও নামছে উপত্যকায়।

ল্যাট্রিন থেকে উঠে আসা প্রস্রাবের ঝাঁঝ রয়েছে বাতাসে। মেয়েরা পাশাপাশি দুটো ল্যাট্রিনে ঢুকেছে। ওগুলোর বাইরে দাঁড়িয়ে হাসাহাসি করছে আই.বি-র লোকাল দুই এজেন্ট, একজন আরেকজনের সিগারেট ধরিয়ে দিচ্ছে।

নিঃশব্দ পায়ে নেমে এসে এক জোড়া ল্যাট্রিনের পিছনে দাঁড়াল রানা। ওগুলোর ভিতরে নিচু গলায় কথা বলছে উত্তরা আর মোহনা। মেটাল ওয়ালে মৃদু টোকা দিল ও। চুপ হয়ে গেল ওরা।

'উত্তরা, আমি রানা।'

আবার কথা বলে উঠল ওরা দুজন, উত্তেজিত ও চাপা কণ্ঠে নিজেদের মধ্যে তর্ক করছে। তারপর উত্তরার প্রশ্ন ভেসে এল, গলায় রাজ্যের উদ্বেগ। 'কোথায় তুমি? এখানে এলে কীভাবে?'

'বাইরে বেরিয়ো না,' বলল রানা। 'দেয়ালের কাছ থেকে সরে থাকো। দেখি ওখান থেকে বের করা যায় কি না।'

'আমরা এখানে দুজন,' বলল উত্তরা।

'জানি। একটু ধৈর্য ধরো।'

সেই কুকুরটা ঘেউ করে উঠল। বেশি দূরে নয়। এক গাছ থেকে আরেক গাছের আড়াল পাওয়ার জন্য দ্রুত জায়গা বদল করছে মানস, পৌঁছে যাচ্ছে ল্যাট্রিনগুলোর পিছনে। ওর উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল রানা।

পকেট থেকে টেপ-এর রোলটা বের করল মানস।

ঘুরে ল্যাট্রিনগুলোর একপাশে চলে এল রানা, একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াল পাহারায়। ব্রাউন সাফারি সুট পরা আই.বি-এর লোকাল এজেন্টরা এখনও মেয়ে দুটোকে নিয়ে হাসাহাসি করছে।

কুকুরটা আরও জোরে ডাকছে, নামছে রানার বামদিকের পাহাড় বেয়ে। ঘাড় ফিরিয়ে সেদিকে একবার তাকাল মানস, ঠোঁটের কোণে স্নেহমাখা এক চিলতে হাসি। তারপর ব্যস্ত হাতে

দুই ল্যাট্রিনের মেটাল ওয়াল-এ টেপ সাঁটতে শুরু করল– জানালার আকৃতিতে।

মানসের দেওয়া গ্যাস বোমাটা বের করল রানা, তারপর হাত ভরল ওর ব্যাকপ্যাকের সাইড পকেটে।

গলায় বাঁধা রশি পিছনে উড়ছে, দাঁত দিয়ে চিবানোয় থেঁতলে গেছে শেষপ্রান্ত, গাছপালার ভিতর দিয়ে তীরবেগে ছুটে আসছে ডোবারম্যান পিনশারটা সোজা রানার দিকে।

ঘাড় ফেরাল আই.বি গার্ডরা, হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠেছে তারা, কাঁধ থেকে নামিয়ে হাতে নিল রাইফেল। কাঁটাতারের ভিতর ও বাইরে থেকে আরও লোকজন ল্যাট্রিনগুলোর দিকে তাকাল, বোঝার চেষ্টা করছে কী কারণে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে কুকুরটা।

কাছাকাছি প্রি-ফেব্রিকেটেড হাট-এর একটা দরজায় এসে দাঁড়াল ফুটবল আকৃতির এক চিনা। এরকম চওড়া মানুষ খুব কমই দেখা যায়। চল্লিশের মত বয়স, মাথা কামানো। দেখামাত্র চিনতে পারল রানা– থাই টং-এর লিডার জিকো তানাই।

ঢাল বেয়ে ছুটে আসছে ডোবারম্যান পিনশার, তবে সেটাকে জিকো তানাই দেখতে পাচ্ছে বলে মনে হলো না।

পাহাড়ের আরও অনেকটা উপরে, প্রায় চারশো ফুট উঁচুতে, কয়েকজন লোকের আভাস পেল রানা। তারা গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে থাকলেও, তাদের কমব্যাট ড্রেস ঠিকই চিনতে পারল রানা। তা হলে, একটা ভারতীয় টিম এখানে– এখনই নীচে নামবার সুযোগ কিংবা সাহস পাচ্ছে না।

ওদের কাছ থেকেই ছুটে এসেছে ডোবারম্যান পিনশারটা।

কিছু একটা সন্দেহ করে ঘুরে গেল আই.বি গার্ড দুজন, ল্যাট্রিনের পিছন দিকটা দেখতে আসছে তারা।

পিছু হটছে রানা।

ওয়ন-এর তীব্র ঝাঁঝে ভরে উঠল বাতাস। ভোঁতা একটা আওয়াজ হলো। বিসিআই-এর টেকনিকাল ডিপার্টমেন্টের

বানানো স্পেশাল টেপ শক্ত মেটাল গলিয়ে ফেলেছে, ফলে চৌকো আকৃতি দুটো খসে পড়েছে মাটিতে।

প্ল্যান অনুযায়ী মেয়ে দুটোকে নিয়ে পাহাড়ে উঠে যাবে মানস। কিন্তু ওর কুকুর এত তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাওয়ায় এখন আর তা বোধহয় সম্ভব নয়। কুকুরটা যে দৌড়াদৌড়ি আর হাঁক-ডাক শুরু করেছে তার সমাপ্তি ঘটা দরকার, উপত্যকার পরিবেশ আবার স্বাভাবিক হয়ে আসাটা জরুরি।

ব্যাকপ্যাক থেকে বের করা রেশন ভর্তি ক্যানটা খুলে কুকুর আর গার্ডদের জন্য অপেক্ষা করছে রানা।

আগে পৌঁছল গার্ড দুজন।

ল্যাট্রিনের আড়ালে ওকে দাঁড়ানো দেখে একযোগে রাইফেল তুলল ওর বুক লক্ষ্য করে। পিছু হটছে রানা।

'হল্ট!' আদেশ করল একজন।

আরেকজন বলল, 'কে তুমি?'

এমনি সময়ে পৌঁছে গেল ডোবারম্যান পিনশার। পরিচিত খাবারের গন্ধ পাচ্ছে, অথচ লোকটা একদম অচেনা। ব্যাপারটা ভয়ানক সন্দেহজনক বলে মনে হলো ভোলার। গায়ের লোম সঙ্গে সঙ্গে খাড়া হয়ে গেল, ঠোঁট ভাঁজ হয়ে বেরিয়ে পড়ল চকচকে ধারাল দু'সারি দাঁত।

'ভোলা!' বলল রানা, ঠিক মানস যেভাবে শিখিয়ে দিয়েছে–নরম, আদুরে সুরে। তারপর হাতের কৌটার খাবারটা ছুঁড়ে দিল কুকুরটার পায়ের সামনে।

এক পা এক পা করে আবার পিছু হটছে রানা।

খাবারটা শুঁকল ভোলা, চোখ তুলে কাকে যেন খুঁজল।

রানা পিছাচ্ছে, গার্ড দুজন একই গতিতে এক-পা এক-পা করে এগোচ্ছে। এভাবে ল্যাট্রিনগুলোর পিছন দিকে চলে আসছে ওরা।

ক্যাপসুল ধরা হাতটা রানার পিছনে। পিন খুলে মাটিতে

ফেলে দিল সেটা। ভাল করে দেখে নিয়েছে বাতাস যেদিকে বইছে সেদিকেই গার্ডরা রয়েছে কি না। ত্রিশ সেকেন্ড পর ফাটবে ওটা।

'হল্ট!' আবার গর্জে উঠল গার্ডদের একজন, ভাব দেখে মনে হলো রানা না থামলে গুলি করতে প্রস্তুত সে।

রানার আচরণে ক্ষতিকর কোনও ভাব নেই, তাই দ্বিতীয় গার্ড গুলি করবার কথা ভাবছে না।

ল্যাট্রিনের দেয়ালে তৈরি চৌকো ফাঁক দুটো দেখে হাঁ হয়ে গেল গার্ডরা। ভিতরে কেউ নেই দেখে চমকে গেল পিলেও।

'সে লম্বা এক কাহিনি,' ওদেরকে বলল রানা, হাসছে। প্রথম গার্ড গুলি করতে যাচ্ছে, বুঝতে পেরে তার রাইফেলের নলে থাবা চালাল ও। হ্যাঁচকা টানে ওটা কেড়ে নিয়ে ফেলে দিল মাটিতে।

পরমুহূর্তে আধ পাক ঘুরে গেল শরীরটা, সেই সঙ্গে প্রচণ্ড এক কিক মারল দ্বিতীয় লোকটার চোয়ালে। এর রাইফেলটাও খসে পড়ল মাটিতে।

মাটিতে পড়া রাইফেল তোলার জন্য ডাইভ দিল গার্ডরা, একই সময় রানা শুনতে পেল পুট্ করে শব্দ তুলে বিস্ফোরিত হলো গ্যাস বোমা। সঙ্গে সঙ্গে আটকে ফেলল দম।

শ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে নার্ভ গ্যাস পৌঁছানো মাত্র চোখ উল্টে গেল গার্ডদের। ডাইভ দিয়ে মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেছে তারা।

ভাল বাতাস বইছে, কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষার পর লাশ দুটোর পাশে এসে দাঁড়াল রানা। ওদের বেল্ট থেকে পিস্তল দুটো বের করে নিল।

'চলে এসো, ভোলা!' ডাকল ও, ঠিক যে সুরে শিখিয়ে দিয়েছে মানস। আবার পিছু হটে ল্যাট্রিনের পিছনে চলে এল রানা, রানওয়ে থেকে যেদিকটা দেখা যায় না।

লেজটা ঘনঘন নেড়ে, মাথাটা নত করে, যেন মালিকের অনুকরণে বিনয়ের অবতার সেজে রানার পায়ের দিকে হেঁটে আসছে ভোলা।

একটু ঝুঁকে কুকুরটার কান চুলকে দিল রানা, মাথা কাত করে কোথায় কী শব্দ হয় শুনছে। কাজকর্ম শুরু হওয়ার আওয়াজ হচ্ছে। গলা চড়িয়ে নির্দেশ দেওয়ার শব্দও ভেসে এল।

উপত্যকায় জমায়েত হওয়া লোকজন বিরক্তিকর কুকুরটা সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। হাট-এর দোরগোড়া থেকে ভিতরে চলে গেছে জিকো তানাইও।

গুলির শব্দ না হওয়ায় আই.বি ও থাই টং-এর সদস্যরাও ধরে নিয়েছে, কোথাও কোনও গোলমাল দেখা দেয়নি, মেয়ে দুটোকে ঠিকমতই পাহারা দিচ্ছে সশস্ত্র গার্ডরা। ইতিমধ্যেই যার যার কাজে মন দিয়েছে ওরা।

রানার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে কুকুরটা, বার বার মাথাটা কাত করছে একদিকে। ওটার বিভ্রান্তি দূর হচ্ছে না– এই খাবার চেনে, সুরও পরিচিত, কিন্তু এ লোক তো তার মনিব নয়!

আরেকটা কৌটা খুলল রানা। সেটা ভোলাকে খেতে দিয়ে বলল, 'আশপাশেই থেকো, ভোলা। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে আমার।'

ঢাল বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করল ও। মানস আর মোহনাকে নিয়ে প্রজাদের সেই গোলাঘরে ওর জন্যে অপেক্ষা করবার কথা উত্তরার। ওটার ভিতরেই নায়েবের একটা শাখা অফিস খোলা হয়েছে।

আঠারোশো ফুট উপরে আদিবাসীদের বসতি। নায়েবের অফিসে রানাকে ঢুকতে দেখে ছুটে এসে রানাকে জড়িয়ে ধরল উত্তরা।

‘ওরা বলাবলি করছিল তোমাকে নাকি মেরে ফেলা হয়েছে!’

‘দেখতেই পাচ্ছ কথাটা সত্যি নয়,’ বলল রানা, ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। ‘ওরা তোমাদেরকে বন্দি করেছিল কেন?’

‘ওরা টের পেয়ে গেছে আমরা তোমাকে সাহায্য করছি,’ বলল উত্তরা।

‘এখান থেকে সরে যেতে হবে, উত্তরা,’ রানার গলায় তাগাদার সুর। ‘ওরা আমাদেরকে খুঁজতে বেরুবে।’

‘নিশ্চয়ই একটা প্ল্যান আছে তোমার?’ জানতে চাইল উত্তরা।

‘সেটা অত্যন্ত ভাল প্ল্যান হতে হবে, মাসুদ ভাই,’ গম্ভীর সুরে বলল মোহনা। ‘বিদেশি স্পাই স্যাবটাজ চালাবার হুমকি দিয়েছে, এ-ধরনের অজুহাত তৈরি করে দুর্গের চারপাশে ওরা কয়েকশো মিলিটারি পুলিশ মোতায়েন করেছে, তাদের সঙ্গে আছে মার্কিন ঘাঁটি থেকে আসা বেশ কিছু মেরিন, স্পাই, টেকনিশিয়ান ও নাসার বিজ্ঞানী। সত্যি কথা বলতে কী, এখানে কিছু করতে হলে পুরোদস্তুর যুদ্ধ শুরু করতে হবে। সেই যুদ্ধটা পাঁচ-সাতজন লোককে দিয়ে হবে না।’ হতাশ ও ম্লান দেখাচ্ছে তাকে।

‘প্রথমে আমার ইনফরমেশন দরকার,’ বলল রানা। ‘উত্তরা, আমি তোমাদের নায়েব ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে চাই।’

‘নায়েব কাকা তো আজ এদিকে আসবেন না,’ বলল উত্তরা। ‘ঠিক আছে, চলো, আমরা তাঁর বাড়িতে যাই।’

লেযার পোড়া গাছপালাকে পাশ কাটিয়ে, তামাক খেতের উপর দিয়ে, উতরাই পেরিয়ে ওদেরকে পথ দেখাল উত্তরা। এদিকে কিছু পাখির কিচিরমিচির শোনা গেল। ঘাসজমিতে ছাগল চরাচ্ছে রাখালরা। অবশেষে প্রায় আটশো ফুট নীচে নেমে সাদা চুনকাম করা একটা বাড়ির সামনে থামল ওরা। দরজার

মাথায় গৌতম বুদ্ধ-র একটা মূর্তি।

কাছেই এক প্রৌঢ়া মহিলা হাতের ভাঁজে চেরা কাঠ নিয়ে দরজার দিকে ফিরছে। তার পিছু নিয়ে বাড়িটার উঠানে ঢুকল ওরা। উত্তরা তার নায়েব কাকাকে দেখল, চুলোর সামনে মোড়ায় বসে আছেন। চুলোয় গরম করা হচ্ছে আলকাতরা, তাতে নারকেল তেল ঢেলে নাড়ছেন তিনি। ওদের পায়ের আওয়াজ পেয়ে মুখ তুলে তাকালেন ভদ্রলোক।

উত্তরাকে দেখে মোড়া ছেড়ে দাঁড়ালেন নায়েব। 'তুমি, মা জননী? আমাকে খবর দিলেই তো পারতে...'

'আসুন, পরিচয় করিয়ে দিই,' বলল উত্তরা।

পরিচয় পর্ব ও কুশলাদি বিনিময় শেষ হতে নায়েব ভদ্রলোককে সরাসরি বলল রানা, 'আমি জেটটা সম্পর্কে জানতে চাই।'

রানার দিকে নয়, উত্তরার দিকে তাকিয়ে কথা বলছেন নায়েব। 'ওঁদেরকে এখানে নিয়ে আসা উচিত হয়নি তোমার।'

অপ্রস্তুত দেখাল উত্তরাকে। রানা আগেই জেনেছে যে বাবার বন্ধু হওয়ায় নায়েবের কথার উপর কথা বলে না সে।

'আপনি ভয় পেয়েছেন,' ভদ্রলোককে বলল রানা। 'জেটটা এখানে আসায় প্রজাদের শান্তি ও নিরাপত্তা নষ্ট হয়ে গেছে।'

রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেন প্রৌঢ়, চেহারায় উদ্বেগের রেখা ফুটে আছে। 'আমি চাই প্রশ্নের জবাব পাবার পর আপনারা চলে যাবেন, আর কখনও ফিরে আসবেন না।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'ঠিক কবে প্রথম জেটের আওয়াজ পান?'

'ও, আচ্ছা, আপনি তা হলে ওটার কথা জানেন!' বিস্মিত দেখাল নায়েবকে। 'আজ থেকে ঠিক ষোলো দিন আগে গভীর রাতে ল্যান্ড করে জেটপ্লেনটা।'

'আচ্ছা! তারপর উপত্যকা ছেড়ে চলে গিয়েছিল প্লেনটা।

ঠিক কবে বলুন তো?'

'পাঁচদিন আগে উড়ে যায়, শুক্রবারে, এই সন্ধের খানিকক্ষণ আগে।'

'তারপর ফিরে আসে কখন? সেই একই রাতে?' জানতে চাইল রানা।

মাথা ঝাঁকালেন নায়েব। 'সাত ঘণ্টা পর।'

'ধন্যবাদ। আর কিছু জানার নেই আমার,' বলেই ঘুরল রানা। ওর পিছু নিয়ে ফিরতি পথ ধরল সবাই।

মাথা নিচু করে হাঁটছে রানা, মাথার ভিতর চলছে চিন্তার জাল। এতদিনে পরিষ্কার একটা চিত্র ফুটতে শুরু করেছে।

কোনও সন্দেহ নেই যে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে হাইজ্যাক করা হয়েছে আমাদের ফাইটার-বম্বার দুরন্ত ঈগলকেই। প্ল্যানটা করা হয়েছিল– প্লেনটা হাইজ্যাক করে সেটাকে নিয়ে এসে রাখবে থাই টং-এর আস্তানায়, দুর্গের পাশে, লুকানো একটা রানাওয়েতে।

থাই থান্ডারের তিনটে টিম রওনা হলো ঢাকার উদ্দেশে। প্রথম টিম ডক্টর নাদিরাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেল সিঙ্গাপুরে।

দ্বিতীয় টিমের কাজটা ছিল জটিল। হ্যাঙ্গারের ভেতর যে দুটো ঈগল ছিল সেগুলোর স্থান পরিবর্তন করতে হয়েছে ওদেরকে, অর্থাৎ একটার জায়গায় আরেকটাকে রাখতে হয়েছে, আগুন ধরাতে হয়েছে ডেভেলাপ না করা ঈগলে, সবশেষে আকাশে উড়তে হয়েছে ডেভেলাপ করা ঈগল দুরন্তকে নিয়ে। তবে চুপিসারে জায়গা বদল করায় সবাই ধারণা করল ডেভেলাপ করা ঈগলটাই পুড়ে গেছে। আকাশে যেটা চক্কর দিচ্ছিল সেটা ডেভেলাপ করা নয়।

এখানেই তিন নম্বর টিমের প্রসঙ্গ চলে আসে। ফুচুং জানিয়েছে, একটা প্লেন সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। সন্দেহ নেই, ওই প্লেনটাই সংগ্রহ করে এখানে এনে রাখা হয়েছিল

ষোলো দিন আগে গভীর রাতে।

ঘটনার দিন, গত শুক্রবার সন্ধ্যার একটু আগে, সেই প্লেনটা এখান থেকে রওনা হয়। ঠিক সময়মত ঢাকার আকাশে পৌঁছে ওটার ক্রুরা দেখল, ডেভেলাপ করা ঈগলটা চক্কর দিচ্ছে আকাশে। সেটার বদলে, সেটার জায়গায়, চক্কর দিতে শুরু করে এখান থেকে পাঠানো জেটটি। আর ডেভেলাপ করা দুরন্ত ঈগলকে ঢাকা থেকে নিয়ে আসা হয় এখানে, থাই টং-এর লুকানো রানওয়েতে। সেটাই চোখে পড়ে যায় ইমরুল কায়েসের।

এখানে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষী-প্রমাণ মুছে ফেলার জন্য চিনা তিনজন পাইলটকে খুন করে থাই টং। ওরা ভেবেছিল, আমেরিকা থেকে আসা পাইলট ও টেকনিশিয়ানরা খুব সহজেই এটাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারবে যেখানে খুশি।

কিন্তু তা পারেনি ওরা। ডক্টর নাদিরার ডেভেলাপ করা ইকুইপমেন্টের সফিসটিকেশন লেভেল সম্পর্কে ওদের কোনও ধারণাই ছিল না। তাঁর ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করতে গিয়ে একের পর এক দুর্ঘটনায় পড়তে থাকে ওরা। এমন কী আদিবাসীদের কয়েকটা বসতি পুড়িয়ে ফেলে দুনিয়ার মানুষকে কৌতূহলী করে তোলে। তা ছাড়া অনেকেই জানে পাঁচদিন আগে একটা জেট প্লেন এই উপত্যকা থেকে আকাশে উঠে সাতঘণ্টা পর ফিরে আসে আবার। তাই ডক্টর নাদিরাকে থাই থান্ডারের কবল থেকে যত দ্রুত সম্ভব উদ্ধার করে এখানে নিয়ে আসার প্রয়োজন পড়ল।

কিছুদূর হেঁটে এসে পাহাড়ের কিনারায় থামল রানা, এখান থেকে বেশ খানিকটা নীচে অন্য একটা উপত্যকা দেখা যাচ্ছে, সেটার উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে চলেছে পাহাড়ি একটা ঝর্না, রোদ লেগে ঝলমল করছে পানি।

কাজ হবে কি না জানে না, কিন্তু একটা প্ল্যান তৈরি হয়ে

গেছে রানার মাথায়। ধরা দিতে হবে এবার।

থাই টং-এর জেটি ও ডক থেকে যে রাস্তাটা দুর্গের দিকে চলে গেছে, সেখানে নেমে এসে উত্তরার হাতে দখল করা পিস্তলগুলোর একটা ধরিয়ে দিল রানা। এখানে ওরা শুধু দুজনই। বিশেষ কাজ দিয়ে মোহনা আর মানসকে পাহাড়ের উপর রেখে এসেছে রানা।

'কী করতে হবে ভাল করে বুঝেছ তো?' জানতে চাইল রানা।

শান্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে মাথা ঝাঁকাল উত্তরা। প্রত্যাশায় উদ্ভাসিত হয়ে আছে তার চেহারা। 'আমাকে দু-মুখো সাপের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে, এই তো?' মৃদু শব্দে হেসে উঠল সে।

'হ্যাঁ।'

'আমার গল্প বিশ্বাস করবে তো ওরা?'

'করবে,' নিশ্চয়তার সঙ্গে বলল রানা। 'তুমি অবাক হয়ে যাবে কত সহজে বিশ্বাস করে তা-ই দেখে।'

রাস্তা ধরে দুর্গের দিকে হাঁটল ওরা, তারপর একটু ঘুরে গিয়ে খোলা মাঠের উপর দিয়ে এগোল, পাশেই কাঁটাতারের বেড়া। রানা সামনে রয়েছে, উত্তরা পিছনে; উত্তরার হাতের পিস্তল রানার শিরদাঁড়া লক্ষ্য করে ধরা।

দূর থেকেই দেখা গেল হ্যাঙ্গারের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে জেট প্লেনটা। কাঁটাতারের বেড়ার বাইরে, রানওয়ের পাশে, প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড হাটগুলোও ক্রমশ কাছে চলে আসছে। টহল রত থাই টং-এর সদস্যরা থমকে দাঁড়াল ওদের দেখে। একজন ছুটে ঢুকে পড়ল হাট-এ– নিশ্চয়ই জিকো তানাইকে খবর দিতে গেল।

'আমার বলতে হবে, মোহনার প্রেমিক ইমরুল কায়েস খুন

হয়ে যাওয়ায় ওর মতিগতির ঠিক নেই,’ বিড় বিড় করে রিহার্সেল দিয়ে নিচ্ছে উত্তরা। ‘ওকে আর বিশ্বাস করা যায় না। তাই ওর কাজটা আমার ওপর বর্তেছে। আমি চাই, বিদেশি গুপ্তচর এই ধূর্ত মাসুদ রানাকে কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিয়ে অযথা হয়রানি থেকে আমার প্রজাদের রক্ষা করতে। তাই প্রথম সুযোগেই এই দুর্বৃত্তকে ধরে নিয়ে এসেছি টং চিফের কাছে।’

‘হ্যাঁ, ঠিক আছে,’ বলল রানা। ‘নিজের আনুগত্যের প্রমাণ দিতে এসেছ তুমি। কেউ এটা অস্বীকার করতে পারবে না।’

কথা না বলে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে রানার পিঠের দিকে তাকিয়ে থাকল উত্তরা।

চোদ্দো

বিশাল বপু নিয়ে হাট থেকে বেরিয়ে এল থাই টং-এর লিডার জিকো তানাই। সরু চোখে শীতল, একাগ্র, স্থির দৃষ্টি। ধৈর্যের সঙ্গে পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করছে। চকলেট রঙের সিগারেটে টান দিয়ে এমন ভঙ্গিতে কয়েকটা রিঙ তৈরি করল, সে-ই যেন গোটা দুনিয়ার মালিক।

জিকো তানাইয়ের পাশে এসে দাঁড়াল জুতনা মংকট, হাতে একটা একে-ফোরটিসেভেন। থাই ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ-এর লোকাল অফিসের হেড সে। লম্বা, চেহারায় থাই বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট, মুখে কালো তিল গিজগিজ করছে। মুখে কথা আটকে যায়–তোতলা।

রানা জানে, দুনিয়ার একনম্বর সুপারপাওয়ারকে সাহায্য

করছে মংকট। ওকে দেখে ঘৃণায় জ্বলে উঠল মংকটের চোখ, হাতের অস্ত্রটা ধীরে ধীরে তুলল, তাক করল রানার বুকে, কর্কশ শব্দে হেসে উঠে নামিয়ে নিল আবার।

রানা ও উত্তরাকে ঘিরে রেখেছে লোকাল আই.বি আর থাই টং-এর কয়েকজন সদস্য। সবার অস্ত্রই যে রানার দিকে তাক করা, তা নয়; কেউ কেউ কাভার করছে উত্তরাকেও। ধীর পায়ে ওদেরকে নিয়ে জিকো তানাই আর জুতনা মংকটের সামনে এসে দাঁড়াল তারা।

'আগে ওকে সার্চ করো,' নির্দেশ দিল জিকো তানাই।

দ্রুত, দক্ষতার সঙ্গে রানাকে সার্চ করল একজন থাই টং সদস্য। ওয়ালথার, ছোট্ট একটা রেডিও, ছুরি ও ব্যাকপ্যাক–সব হাতছাড়া হয়ে গেল।

'মাসুদ রানা,' বলল জিকো তানাই। 'অনেক বড় স্বপ্ন নিয়ে দেশ থেকে এসেছিলে, কিন্তু ভেঙে গেল সেটা! শেষ পর্যন্ত একটা মেয়ের কাছে ধরা খেয়ে সোজা এসে ঢুকলে যমের বাড়ি। ...ধন্যবাদ, উত্তরা। যে-সাহায্য করলে, তার জন্যে নিশ্চয়ই বিরাট পুরস্কার পাবে তুমি তোমার অফিস থেকে।'

'এর মধ্যে উত্তরার কৃ-কৃতিত্ব কতটুকু সেটা বি-বিবেচনা করে দেখতে হবে,' বলল মংকট। 'আরও অনেক আ-আগেই রানা আর মোহনার হদিস ওর কাছ থেকে পাব বলে আশা করেছিলাম আমরা।'

কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল উত্তরা।

'*আমরা* মানে আসলে থাই কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের অপারেশন্স চিফ সত্যশুভ চুনাভান, তা-ই না?' বলল রানা।

রানার কথা শুনে ছানাবড়া হয়ে উঠল উত্তরার চোখ।

'ও, তুমি তা-তা হলে জা-জানো?' মংকটের কথায় শ্লেষ।

রানার জানা আছে, মোহনা আর উত্তরা সরল বিশ্বাসে চুনাভানকে রিপোর্ট করছিল ওর গতিবিধি ও প্ল্যান সম্পর্কে,

কারণ ওদেরকে ধারণা দেয়া হয়, মাফিয়াদের সাহায্য নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে অপারেশন চালাচ্ছে, তাতে চুনাভানের বিন্দুমাত্র সমর্থন নেই, সাধ্যমত বাধা দেবে সে।

'এতক্ষণে বুঝলাম!' কঠোর দৃষ্টিতে উত্তরাকে আপাদমস্তক দেখল রানা, তারপর বলল, 'রানা এজেন্সির ব্যাংকক শাখার প্রধান লাবণী কোটা বাহারুর কোন্ হোটেলে উঠবে, উত্তরা তা জানত। তার কাছ থেকে জেনেছিল মোহনা, সঙ্গে সঙ্গে রুটিন রিপোর্ট হিসেবে তার ইমিডিয়েট বস্ চুনাভানকে জানায়। চুনাভান খবর পৌঁছে দেয় থাই থান্ডার লিডার চক্রি চুয়ানের কাছে। চুয়ান তার বান্ধবীকে পাঠিয়ে খুন করায় লাবণীকে।'

'বাহ্, অঙ্কে দেখা যাচ্ছে তো-তোমার মাথা ভাল,' বলল মংকট। 'হিসেব মেলাতে ও-ওস্তাদ।'

'শুধু নিজের হিসেবটা মেলাতে পারেনি, গুবলেট করে ফেলেছে,' বলল জিকো তানাই, হাওয়ায় আরও কয়েকটা রিঙ তৈরি করল। 'তুমি শেষ, রানা। ধরে নাও মারাই গেছ।'

'সরে দাঁড়াও সবাই, পি-প্লিজ,' বলে হাতের অস্ত্রটা আবার রানার বুকে তাক করল মংকট। 'বিপজ্জনক ঝামেলা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মি-মিটিয়ে ফেলাই ভাল। প্লেনটার সঙ্গে ওর লাশটাও নিয়ে যেতে পারলে ভারি খুশি হবেন আমেরিকান এয়ারফোর্সের অপারেশন্স চিফ কমান্ডার ডুগার্ড ম্যাকমোহান।'

'না, এখনই নয়,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল জিকো তানাই। উত্তরার দিকে তাকাল সে, পরিস্থিতি থেকে কী ধরনের সুবিধে পাওয়া যায় চিন্তা-ভাবনা করে দেখতে চায়। 'রানা নিশ্চয়ই একা আসেনি? কজন ওরা?'

'চুনাভান সারকে আগেই তো সব জানিয়েছি আমি,' বলল উত্তরা। সামলে নিয়েছে নিজেকে। 'রানার সঙ্গে শুধু আর একজন ছিল, ইন্ডিয়ান। আর ছিল মোহনা। চুনাভান সার নির্দেশ দেন আমি যেন ইন্ডিয়ানটাকেও ধরে আনি এখানে। কিন্তু তা

সম্ভব হয়নি। শুধু রানাকেই আনতে পেরেছি।'

'ইন্ডিয়ানটা কোথায়?' জানতে চাইল জিকো তানাই। 'আর মোহনা?'

'পাহাড়ে,' বলল উত্তরা। 'ইন্ডিয়ান লোকটার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে।'

'কেন?'

'বাহ, আপনারা জানেন না, ও তো রানা এজেন্সির শাখা-প্রধান ইমরুল কায়েসের বান্ধবী ছিল– যাকে আপনারা খুন করেছেন। কায়েসের সন্তান রয়েছে ওর গর্ভে।'

মাথা ঝাঁকাল মংকট। 'ক-কথা কিন্তু ঠিক, বস্।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গোটা ব্যাপারটা নতুন করে সাজাল তানাই। মিল পেয়ে মাথা ঝাঁকাল, তারপর বলল, 'ঠিক আছে। এবার শোনা যাক, ওদের প্ল্যানটা কী।'

'আমি শুধু জানি ওরা একটা প্ল্যান করেছে, কিন্তু সেটা কী তা জানি না,' বলল উত্তরা। 'কী কারণে যেন আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছে ওরা। হয়তো ভেবেছে আমি জানলে ফাঁস করে দেব। তবে সন্দেহ করছি, কোনও একটা দেশের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করবে ওরা। এটুকুই বলতে শুনেছি রানাকে।'

হেসে উঠল তানাই। হাসবারই কথা, কারণ সুস্থ মস্তিষ্কের কেউ বিশ্বাস করবে না, একটা প্লেনের জন্য থাইল্যান্ড আক্রমণ করবে কোনও রাষ্ট্র।

মংকট হাসল না, গম্ভীর হয়ে উঠল তার চোখ-মুখ। 'এটা তো খু-খুব খারাপ কথা যে তুমি জা-জানো না ওদের প্ল্যানটা কী,' গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে না পারায় উত্তরাকে তিরস্কার করল সে।

সব মিলিয়ে উত্তরার জন্য পরিবেশটা তেমন অনুকূল থাকছে না। এখন যদি তাকে অ্যারেস্ট করা হয়, রানার কোনও সাহায্যেই আসতে পারবে না সে।

‘ও... রানা, আমার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে প্ল্যানটা করে, আমি যাতে কিছু শুনতে না পাই,’ বলল উত্তরা, এবার সরাসরি মংকটের দিকে তাকাল। ‘কিন্তু আমি ওকে ধরেছি! ধরে এখানে নিয়ে এসেছি!’

‘কেন? তুমি ঝুঁকি নিতে গেলে কেন? তোমার কী স্বার্থ?’

‘আমার প্রজারা,’ দৃঢ়কণ্ঠে বলল উত্তরা। ‘আমি চাই এই এলাকায় এসব চোর-পুলিশ খেলা শেষ হোক, শান্তি ফিরে আসুক ওদের জীবনে।’

আবার মাথা ঝাঁকাল থাই টং চিফ তানাই। মংকটের দিকে ফিরে বলল, ‘ঠিক আছে, রানার পেট থেকে সব বের করছি।’ হিপ-হোলস্টারে গোঁজা পিস্তলের বাঁটে হাত বুলাচ্ছে।

‘যেভাবে ডক্টর নাদিরার কাছ থেকে বের করেছ সব?’ মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করল রানা। ‘হুমকি দিয়ে, নির্যাতন চালিয়ে কোনও সুবিধে করতে পারেনি থাই টং। ওগুলো ছাড়া আর তো কিছু জানোও না তোমরা।’

সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে রানার দিকে ধোঁয়ার রিঙ ছুঁড়ল জিকো তানাই। ‘আমার বিশ্বাস, উত্তরাও জানে না যে তুমি আসলে স্বেচ্ছায় এখানে এসেছ,’ বলল সে, মংকট কিংবা উত্তরা সম্পর্কে এখন তার আর কোনও আগ্রহ নেই। ‘এই আসাটা তোমার প্ল্যানের একটা অংশ, ঠিক কি না?’ রানাকে প্রশ্ন করল সে।

‘ঠিক ধরেছ,’ বলল রানা। ‘এবার আমরা নিরিবিলিতে কথা বলতে পারি?’

জিকো তানাইয়ের অস্থায়ী অফিসে একটা মাত্র জানালা। সেটার দিকে পিছন ফিরে মস্ত রিভলভিং চেয়ারটায় বসল সে। হাত তুলে খালি চেয়ারটা রানাকে দেখাল। সামনে একটা ডেস্ক, তাতে বেশ কিছু ফাইল ও ফোল্ডার স্তূপ করা। পিছু নিয়ে

কয়েকজন গার্ড ঢুকেছে, হাত-ইশারায় অফিস থেকে তাদেরকে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিল।

'আপনি থাকুন, মিস্টার মংকট,' বলল তানাই। 'বাকি সবাই যাও, খুঁজে বের করো মানস আর মোহনাকে। উত্তরাকে জেরা করো। তার মাথায় কিছুই নেই, এ আমি বিশ্বাস করি না।' সুইভেল-চেয়ার ঘুরিয়ে বাইরে তাকাল থাই টং চিফ।

বাইরে কাঁটাতারের বেড়া, হ্যাঙ্গার, হ্যাঙ্গারের সামনে জেট প্লেন ইত্যাদি সবই দেখা যাচ্ছে।

অফিসে একটাই দরজা, সেটার পাশে পজিশন নিল মংকট।

'ঠিক আছে, মাসুদ রানা,' চেয়ার ঘুরিয়ে নিয়ে বলল তানাই। 'তোমার অফারটা কী?'

এতক্ষণে তানাইয়ের দেখানো কাঠের চেয়ারটায় বসল রানা। 'তোমার ভাল করেই জানা আছে, ডক্টর নাদিরাকে কিডন্যাপ, তাঁর ডেভেলাপ করা চিনা জেট দুরন্ত ঈগল হাইজ্যাক, এ-সবই দুনিয়ার সেরা পরাশক্তি আমেরিকার নির্দেশে ঘটেছে,' বলল রানা। 'প্লেনটা যেহেতু আরেক পরাশক্তি পিপ্‌ল্‌স্‌ চায়নার তৈরি, তাই কাজটা নিজে করতে সাহস পায়নি আমেরিকা। কাজটা চাপানো হয় তাইওয়ানিজ সরকারের ঘাড়ে। অনুরোধে ঢেঁকি গিললেও, তারাও চিনকে ঘাঁটাতে সাহস পেল না– বোঝাটা চাপাল তাইওয়ানিজ টঙের কাঁধে, ওরা চাপাল থাই টং, অর্থাৎ তোমার মাথায়।'

'এত কথা তুমি জানলে কীভাবে?'

'এটা-সেটা দেখে। ডক্টর নাদিরার কাছ থেকে ফাইটার-বম্বার দুরন্ত ঈগল সম্পর্কে ইনফরমেশন চাইছে আমেরিকানরা,' বলল রানা, ডেস্কের উপর সামান্য ঝুঁকল। 'ওটার বিস্তারিত ডিজাইন পেলে সবচেয়ে খুশি হয় তারা। আমার ওপর নির্দেশ আছে, যে-কোনও মূল্যে ডক্টর নাদিরা আর ওই প্লেনটাকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।'

প্রস্তাবটায় নাটকীয়তা আনার জন্য থামল রানা। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে জিকো তানাই আর জুতনা মংকট।

'আমি তাঁকে রাজি করাব,' ঝাড়া দশ সেকেন্ড পর বলল রানা। 'দুরন্ত ঈগলের একটা ডিজাইন এঁকে দেবেন ডক্টর নাদিরা, দুজন পাইলটকে শেখাবেন দুরন্ত ঈগলের যন্ত্রপাতি কীভাবে অপারেট করতে হয়। বিনিময়ে আমাদের সবাইকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে। দুরন্ত ঈগলে চড়ে চলে যাব আমরা।

'শুধু তা-ই নয়, আমাদের সঙ্গে ওই প্লেনে আমেরিকান এয়ারফোর্সের অপারেশন্স চিফ কমান্ডার ডুগার্ড ম্যাকমোহানও থাকবেন, আকাশে ওঠার পর ওটাকে যাতে কেউ গুলি করে ফেলে না দেয়।' একটু থেমে আরেকটা কথা যোগ করল রানা, 'আমি সংকেত না দিলে চিন নাক গলাবে না।'

চিন্তিত দেখাল জিকো তানাইকে। তারপর মাথা নাড়ল সে। 'আমাকে যারা ভাড়া করেছে সেই পরাশক্তি এমন কিছু করবে না যাতে দুনিয়ার লোক জেনে ফেলে এই ব্যাপারটার সঙ্গে তারা জড়িত। তোমার এই প্রস্তাবে তারা যদি রাজি হয়ও, তোমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে সাজানো নাটকের মাধ্যমে– সবাই জানবে তোমরা পালিয়েছ, পালাবার সময় জিম্মি করেছ ডুগার্ড ম্যাকমোহনকে। তবে এর মধ্যে আরও অনেক জটিলতা আছে।'

'যেমন: তোমার স্বার্থ কী?'

'হ্যাঁ।' মাথা ঝাঁকাল জিকো তানাই। 'একা শুধু আমি নই, কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স আর ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের যে অংশটা জড়িত, তারাই বা কী পাবে।' ইঙ্গিতে দরজার পাশে দাঁড়ানো মংকটকে দেখাল সে।

'তোমাকে ঠকিয়েছে থাই থান্ডার: এই ছুতো দেখিয়ে প্রভুর কাছ থেকে অতিরিক্ত আরও দশ কি বিশ মিলিয়ন ডলার চাও তুমি,' বুদ্ধি দিল রানা। 'তা থেকে থাই সরকারের সঙ্গে যে-সব টিসিআই আর আই.বি সদস্য বেঈমানী করেছে তাদেরকে কিছু

খয়রাত কোরো। ওদের তো শাস্তি পাবার কথা, তার বদলে তোমার কাছ থেকে কিছু পেয়ে সব যেন ভুলে যায়।'

রানার দিকে রাইফেল তাক করতে যাচ্ছে মংকট, দেখতে পেয়ে ধমক দিল টং চিফ। 'স্টপ ইট!'

'ইচ্ছে করলে আমার প্রস্তাবটাই নিজের প্রস্তাব হিসেবে চালাতে পারো তুমি,' জিকো তানাইকে আবার বলল রানা। 'এতক্ষণে ওদের বোঝা হয়ে গেছে ডক্টর নাদিরা ভাঙবেন, তবু মচকাবেন না। তাদেরকে এ-ও বোঝাও যে প্লেনটাকে অচল অবস্থায় এখানে এভাবে ফেলে রাখাটা মারাত্মক বোকামি হয়ে যাচ্ছে। যখন-তখন যে-কোনও কিছু ঘটে যেতে পারে।'

রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে জিকো তানাই। 'তুমি কিন্তু একবারও বলছ না তোমার কাছ থেকে কী পাব আমি। এটা একটা বিজনেস ডিল, কাজেই খালি হাতে কিছু পাবার আশা কোরো না।'

'এই যে লোভ ত্যাগ করতে পারছ না, এর কারণ আমার কথা হয় ভাল করে শোনোনি, না হয় বিশ্বাস করোনি তুমি,' বলল রানা।

'মানে?'

'তা হলে আবার বলছি, শোনো,' বলল রানা, 'আমি সংকেত না দিলে নাক গলাবে না চিন।'

গম্ভীর হলো জিকো তানাই। 'সিরিয়াস আলোচনায় জোক শুনতে ভাল লাগে না।'

'তা হলে আমার আর কিছু বলার নেই,' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

মনে মনে কী ভাবল সে-ই জানে, নিজের পাওনা নিয়ে আর কিছু বলল না থাই টং চিফ। 'ঠিক আছে, প্রস্তাবটা জানাচ্ছি আমি। দেখা যাক কী প্রতিক্রিয়া হয়।'

পাঁচজন সশস্ত্র গার্ডকে রানার পাহারায় রেখে প্রভুর সঙ্গে

আলোচনা করতে চলে গেল জিকো তানাই। মংকটকেও নিয়ে গেল।

বেশি সময় নিল না, আধঘণ্টার মধ্যে ফিরে এল ওরা। কে জানে কী শুনে এসেছে, দুজনের চেহারাই মড়ার মত ফ্যাকাসে লাগল রানার চোখে।

'ওরা রাজি,' বলল জিকো তানাই। 'তবে ডক্টর নাদিরাকে দিয়ে কাজগুলো তুমি করাতে পারবে কি না সন্দেহ করছে। চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিয়েছে তোমাকে।'

আসলে চব্বিশ ঘণ্টাই দরকার রানার। 'আটচল্লিশ ঘণ্টা হলে ভাল হত,' বলল ও।

'মাত্র একদিন,' বলল তানাই, মংকটের দিকে ফিরে ইঙ্গিত করল। 'প্লেনে নিয়ে যান ওকে। যা যা দেখতে চায় দেখতে দেবেন।'

'একটা প্রশ্ন,' খুক করে কেশে বলল রানা। 'তোমাদের কী হয়েছে বলো তো?'

'অত কথার কী দরকার?'

'আমিই বলে দিচ্ছি,' বলল রানা। 'থাইল্যান্ড সরকারকে চাপ দিচ্ছে বেইজিং, বলছে চিনের কাছ থেকে সাহায্য চাও।'

উত্তেজিত হয়ে উঠল জিকো তানাই: 'গায়ের জোরে সাহায্য করতে চাইছে ওরা।'

মৃদু হাসল রানা।

'তোমার এত খুশি হবার কিছু নেই, মাসুদ রানা,' হিসহিস করে বলল তানাই। 'খবর আরও আছে।'

অপেক্ষা করছে রানা।

'থাইল্যান্ড সরকারকে চাপ দিচ্ছে আমেরিকাও,' জানাল তানাই। 'বলছে– আমাদের কাছ থেকে সাহায্য চাও!'

'থাই সরকারের অবস্থা দেখা যাচ্ছে খুবই সঙ্গীন,' বলল রানা।

দীর্ঘশ্বাস চাপল জিকো তানাই। 'জানতে ইচ্ছে করছে কার অবস্থা সঙ্গীন নয়!'

মংকটের সঙ্গে রওনা হলো রানা, যতটা না খুশি, তারচেয়ে অনেক বেশি উদ্বিগ্ন।

পনেরো

দুরন্ত ঈগলকে এখনও ঘিরে রেখেছে আমেরিকান মেরিন আর থাই মিলিটারি পুলিশ। সতর্ক ও অনিশ্চিত দৃষ্টিতে রানাকে হেঁটে আসতে দেখল তারা, অনুমতি থাকায় প্লেনে উঠতে বাধা দিল না কেউ। রানাকে আগেই জানানো হয়েছে, প্লেনের কাছ থেকে দেশি-বিদেশি পাইলট ও টেকনিশিয়ানদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

আমেরিকান মেরিন সৈন্যরা সবাই শ্বেতাঙ্গ। এরা কমান্ডো, আগেও অনেকবার দেখেছে রানা, তাই চিনতে কোনও অসুবিধে হলো না। তবে মনে খুঁতখুঁতে ভাব জাগিয়ে তুলল থাই মিলিটারি পুলিশ। ইউনিফর্মের ভাঁজ ঠিক নেই, এরকম মিলিটারি পুলিশের কথা কল্পনাও করা যায় না, অথচ এখানে প্লেনটাকে যারা পাহারা দিচ্ছে, তাদের কারও ইউনিফর্মই দু'চারদিনের মধ্যে ধোলাই বা

ইস্ত্রি করা হয়নি।

আরও কিছু খুঁত চোখে পড়ল। এক একজনের মাথার ক্যাপ এক একদিকে বেঁকে আছে। ইউনিফর্মের বোতাম ভাঙা। একটা বুটও পালিশ করা নয়। সবাই তারা চিনা।

ফাইটার-বম্বার দুরন্ত ঈগল লম্বায় পঞ্চাশ ফুট হবে। ভিতরটা শান্ত, সারি সারি কমপিউটার ও রেইডার কনসোল নীরব হয়ে আছে, একটা বাতিও মিটমিট করছে না। শোনা যাচ্ছে না এতটুকু যান্ত্রিক গুঞ্জন। স্ক্রিনগুলো সব অন্ধকার। প্লেনের খোল প্রায় ভরাট হয়ে আছে দুর্বোধ্য টেকনলজিকাল ধাঁধায়।

প্লেনের সামনের অংশে উজ্জ্বল একটা আলো জ্বলছে, সেটার দিকে এগোচ্ছে রানা। ওর ঠিক পিছনেই রয়েছে জুতনা মংকট, তার ক্ষতবিক্ষত চেহারায় অশুভ একটা ভাব ফুটে আছে। বদ্ধ বাতাসে মেশিন-অয়েল, ঘাম ও সিগারেটের গন্ধ।

একটা সিটে বসিয়ে রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে ডক্টর নাদিরাকে, মাথাটা ঝুলে পড়েছে সামনের দিকে। আই.ভি টিউব থেকে দুটো হাতেই তরল মেডিসিন ঢুকছে। সিটের পাশে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে আই.বি-এর একজন গার্ড। জুতনা মংকটকে দেখে স্যালুট করল সে।

'এখানে আমার কর্তৃত্ব থাকলে এ-এতক্ষণে মারা যেতে তুমি,' বলল মংকট, রানার পিঠে গুঁতো মারল একে-ফোরটিসেভেনের মাজল দিয়ে।

ব্যথাটা নীরবে সহ্য করলেও, ধীরে ধীরে ঘুরল রানা, চোখ নামিয়ে প্রায় বুক ছুঁয়ে থাকা রাইফেলের মাজলটার দিকে তাকাল একবার। 'তুমিই তো, না?' জিজ্ঞেস করল ও। 'হাইওয়েতে মোটরসাইকেল, গাড়ি আর হেলিকপ্টার পাঠিয়েছিলে? সত্যশুভ চুনাভানের নির্দেশে, আমার ব্যবস্থা করার জন্যে?' শান্ত আলাপের সুরে বলছে কথাগুলো। 'প্ল্যানিংটা আহামরি কিছু হয়নি।'

রানার ঠাণ্ডা আচরণ দেখে আরও রেগে উঠল মংকট, দাঁতে দাঁত ঘষে হিসহিস করে বলল, 'তো-তোমাকে আমি দেখে নেব!'

ব্যারেলের পাশে একটা আঙুল ঠেকিয়ে অস্ত্রটা বুকের সামনে থেকে একপাশে সরিয়ে দিল রানা। 'পারলে দেখো,' বলল ও। 'তবে তানাই বলে দিয়েছে এখন তোমরা আমাকে ছুঁতে পারবে না।' গার্ডের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল ও।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল গার্ড।

রাইফেল নামিয়ে ঘুসি পাকাল মংকট, তারপর সেটার দিকে তাকিয়ে হতাশায় ভেঙে পড়বার ভঙ্গি করল। কাঁধ দুটো ঝুলে পড়ল, মাথাটা নত হলো। তারপর অকস্মাৎ প্রচণ্ড শক্তিতে একে- ফোরটিসেভেনের বাঁট দিয়ে বাড়ি মারল দেয়ালে। ফাইবারবোর্ড ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। 'তো-তোমাকে আমি খুন করব, হারামজাদা!'

নিঃশব্দে হাসল রানা, জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না। পিছন ফিরল ও, হাঁটু গাড়ল ডক্টর নাদিরার সামনে। ব্লাউজটা এত জায়গায় ছিঁড়ে গেছে, শরীরে ওটা থাকা না থাকা সমান। নীল জর্জেট শাড়িটাও কাদা-মাটি লেগে নোংরা হয়ে আছে। মুখে আঁচড়ের বেশ কয়েকটা দাগ। চোখ বুজে আছেন তিনি।

'ডক্টর নাদিরা,' নরম সুরে ডাকল রানা। বাংলায় বলল, 'আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?'

তাঁর গলার গভীর থেকে কুলকুচো করবার মত আওয়াজ বেরিয়ে এল– দুর্বোধ্য, যেন আহত কোনও পশু ব্যথা ও হতাশায় কাতরে উঠল।

বিজ্ঞানীর চিবুকে তালু রেখে দাগে ভরা মুখটা উঁচু করল রানা। 'ডক্টর নাদিরা,' বলল আবার। 'আমি মাসুদ রানা। আমার কথা মনে পড়ে? আমি আপনাকে মুক্ত করতে এসেছি।'

চোখ মেলে তাকালেন ডক্টর নাদিরা। ধীরে ধীরে দৃষ্টি ফিরে

পাচ্ছেন। ‘প্রথমবার তো পারনি,’ জড়ানো গলায় বললেন তিনি, যদিও ঠিক তিরস্কারের সুরে নয়। ‘তবে বোঝা যাচ্ছে তুমি নাছোড়বান্দা। আবার এসেছ, সেজন্যে ধন্যবাদ।’ সম্ভবত ড্রাগস দেওয়া হয়েছে তাঁকে।

মাথা চুলকাল রানা, জানে প্রতিভাবান প্রায় সব মানুষই একটু অন্যরকম হন—ইনি বড় বেশি স্পষ্টবক্তা। ‘জী, আমার ব্যর্থতা ক্ষমা করবেন।’

‘আচ্ছা। পরেরবার কিন্তু করব না, মনে থাকে যেন,’ বললেন ডক্টর নাদিরা। ‘মানুষের সহ্যেরও তো একটা শেষ আছে! ওরা... ওরা আমাকে...’ আধবোজা চোখ দুটো আবার দৃষ্টিহীন হয়ে আসছে। দু-ফোঁটা পানি নেমে এল গাল বেয়ে।

‘আপনার ওপর ওরা টরচার করেছে?’ নরম সুরে জানতে চাইল রানা।

‘শেষপর্যন্ত বুঝে ফেলে, টরচার করে কোনও লাভ হবে না,’ জড়ানো গলায় বললেন ডক্টর নাদিরা। ‘তারপর আমাদের দুরন্ত ঈগলের রহস্য জানার জন্যে হাতে-পায়ে ধরে এমন অনুনয়-বিনয় শুরু করল, সেই সঙ্গে ওষুধ। আমি... ওদেরকে... দু’একটা... বলে ফেলেছি...’

‘তাতে কিচ্ছু আসে যায় না,’ বলল রানা। ‘কিছু তো ওদেরকে বলতেই হবে, তা না হলে ওরা আমাদেরকে ছাড়বে কেন। তবে এ-সব নিয়ে এখনই উদ্বিগ্ন হবেন না। প্রথমে আপনাকে সুস্থ হতে হবে।’

‘কী জানি... পারব কি না। ওরা... মেডিসিন দিয়ে... আমাকে ওরা...’ যেন বাবার কাছে নালিশ জানাচ্ছে ছোট্ট একটা মেয়ে।

রানার ঘাড়ে আবার রাইফেলের মাজল ঠেকাল মংকট। ‘ইংরেজি, নয়তো থাই ভাষায় ক-কথা বলো,’ কর্কশ সুরে নির্দেশ দিল সে।

'ভয় পাচ্ছ?' ঘাড় ফিরিয়ে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল রানা। 'যার গোলামি করছ সেই জিকো তানাই তো ভয় পাচ্ছে না। সে যাদের গোলামি করছে, তারাও দেখো কেমন সরে দাঁড়িয়েছে। ওদের ওপর তোমার আস্থা নেই?'

রানার দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকল মংকট। ধীরে ধীরে একে-ফোরটিসেভেনটা একপাশে সরিয়ে নিল সে।

ঘাড় সোজা করে আবার ডক্টর নাদিরার বিষণ্ন চোখ দুটোর দিকে তাকাল রানা। 'আমার সঙ্গে কথা বলুন, ডক্টর নাদিরা। সব আপনি মনে করতে পারছেন কি?'

'না, যা ভাবছ তা নয়,' বললেন ডক্টর নাদিরা, জিভে জড়িয়ে যাচ্ছে কথা। 'আমার স্মৃতিশক্তির কিচ্ছু হয়নি।'

'বাহ্, দারুণ!' বলল রানা। 'ডক্টর নাদিরা, দেশের জন্যে, বিশ্বশান্তির জন্যে অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন আপনি, আমরা সবাই তাই গর্বিত, আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ।'

'আমি দেশে ফিরতে চাই,' বললেন তিনি। 'আমার কাজ...কী জানি... আর কি কোনও দিন কাজ শুরু করতে পারব...'

'অবশ্যই পারবেন,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল রানা। 'আমার দিকে তাকান। চোখ দেখে বলুন, আমাকে বিশ্বাস করা যায়?'

রানার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন বিজ্ঞানী। তাঁর কলঙ্কিত চেহারায় আশা ও অবিশ্বাস যুদ্ধ করছে। অবশেষে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। 'হ্যাঁ,' বললেন তিনি, গলাটা কেঁপে গেল। 'যতটুকু পারা যায় আমি সাহায্য করব।'

'ধন্যবাদ, এর বেশি আমরা কিছু আশা করি না।'

চোখ বুজলেন ডক্টর নাদিরা, ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়লেন, আবার সামনের দিকে ঝুলে পড়ল মাথাটা।

সিধে হয়ে মংকটের দিকে ঘুরল রানা। 'শোনো হে, দুই নম্বর,' ইংরেজিতে বলল ও। 'এখনই ডক্টর নাদিরার হাত থেকে

টিউব দুটো খুলে নাও। যতক্ষণ ড্রাগস চলবে, ততক্ষণ কাজের কোনও কথাই বলানো যাবে না তাঁকে দিয়ে। এদিকটা তুমি দেখো, সেই ফাঁকে আমি একটু ঘুমিয়ে নেব। ...রেস্ট নেয়ার কী ব্যবস্থা এখানে?'

'এখানে তোমার চা-চালবাজি বেশিক্ষণ চ-চলবে না,' হুমকির সুরে বলল মংকট। গার্ডের দিকে ফিরে আই.ভি খুলে নেওয়ার ইঙ্গিত দিল সে। তারপর রানার পিঠে মাজল ঠেকিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল দরজার দিকে।

দুপুরের সূর্য আগুন ঝরাচ্ছে দুর্গের চারপাশে। দূরের পাহাড়ি ঢালে চিকচিক করছে অস্থির ঝর্না। হালকা নীল আকাশে সোনালি ডানা মেলে উড়ছে নিঃসঙ্গ একটা চিল।

বন্দি হওয়ার আগে, প্ল্যানটা তৈরি করবার সময়, চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর লিউ ফুচুঙের সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করতে হবে, মোহনাকে তা জানিয়েছে রানা। সন্দেহ নেই, এতক্ষণে ওর মেসেজ পেয়ে গেছে ফুচুং।

এই যুদ্ধক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় বন্দি হয়েছে রানা। এখন যেভাবেই হোক একটা ডাইভারশন তৈরি করতে হবে ওকে, ফুচুঙের নেতৃত্বে চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্ট ও কমান্ডোরা যাতে থাই টঙের এই আস্তানায় চুপিসারে ঢুকে পড়ার সুযোগ পায়—যদিও ওর কোনও ধারণা নেই ফুচুং ঠিক কীভাবে সাহায্য করতে আসবে, কিংবা এই মুহূর্তে কোথায় রয়েছে সে।

নিজের উদ্ভাবনী শক্তির উপরই বেশি নির্ভর করতে হবে রানাকে। ডাইভারশনটা যদি যথেষ্ট ভাল হয়, ডক্টর নাদিরাকে উদ্ধার করা সম্ভব, সম্ভব দুরন্ত ঈগলকে নিয়ে আকাশে উঠে পড়া।

প্লেন থেকে নেমে কাঁটতারের বাইরে বেরিয়ে এল রানা ও মংকট, রানওয়ে ধরে জিকো তানাইয়ের অস্থায়ী অফিস, প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড হাটগুলোর দিকে এগোচ্ছে। সশস্ত্র মিলিটারি

পুলিশরা টহল দিচ্ছে চারপাশে। পরিচ্ছদ ছাড়াও, এবার তাদের আচরণেও অসঙ্গতি লক্ষ করল রানা।

তাদের দাঁড়ানোর ঢিলে-ঢালা ভাব, অমার্জিত ভঙ্গিতে খসখস করে গা চুলকানো, চোখে-মুখে গাম্ভীর্যের অভাব ইত্যাদি একদমই মিলিটারি পুলিশের মর্যাদার সঙ্গে খাপ খায় না।

হঠাৎই ব্যাপারটা রানার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। থাই টং লিডার জিকো তানাই মহা পরাক্রমশালী আমেরিকাকে নিজের আস্তানাই শুধু ভাড়া দেয়নি, মিলিটারি পুলিশও সাপ্লাই দিয়েছে। সেজন্যই এরা সবাই চিনা। আসলে নিজের লোকদেরকেই ইউনিফর্ম পরিয়ে মিলিটারি পুলিশ বানিয়েছে সে।

তার মানে, থাই সরকার ও সামরিক বাহিনী এখনও এই ব্যাপারটার সঙ্গে জড়ায়নি। এখানে কী ঘটছে সে-সম্পর্কে হয়তো পরিষ্কার কোনও ধারণাও নেই তাদের।

এক জায়গায় দেখা গেল আর্মার্ড কার থেকে অ্যামিউনিশন নামানো হচ্ছে। ভ্যান গাড়ি থেকে আরও কিছু থাই সৈন্যও নামল। এদের পরিচ্ছদের হাল আরও খারাপ, আচরণ পাতি গুণ্ডাদের মত। নিজের অন্য কোনও আস্তানা থেকে আরও লোক আনাচ্ছে জিকো তানাই।

চওড়া কিচেন-টেন্ট থেকে মাংস ও মসলার সুবাস ভেসে আসছে।

রানওয়ের ধার ঘেঁষে উত্তরাকে হেঁটে আসতে দেখল রানা, দুশ্চিন্তায় মাথাটা নত হয়ে আছে। বোঝাই যাচ্ছে, টিসিআই-এর অপারেশন চিফ সত্যশুভ চুনাভান আর টিবিআই-এর লোকাল অফিসের হেড জুতনা মংকটের আস্থা অর্জন করতে পারেনি সে। তবে, মন্দের ভাল এই যে, এখনও তাকে বন্দি করা হয়নি।

পাশ কাটাবার সময় কোনও কথা হলো না, তবে চোখাচোখি হতে নীরবে একটা ইঙ্গিত করল রানা, যার অর্থ– সাহস হারাবে না, কাছেপিঠে থেকো।

রানাকে নিয়ে বড়সড় ব্যারাকে ফিরে এল মংকট। ভিতরটা তিন ভাগে আলাদা করা। ডানদিকে জিকো তানাইয়ের তালা দেওয়া অফিস কামরা। ওটার সামনে দুটো ডেস্ক ফেলা হয়েছে, সেগুলোয় বসে আছে লোকাল আই.বি-এর দুজন অপারেটর। একজন টেলিফোনে কথা বলছে, আরেকজন নোটবুকে কী যেন লিখছে। মংকটকে দেখে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াতে যাচ্ছিল তারা, ইশারায় নিষেধ করল সে।

বাম দিকে প্যাসেজ। সেটা ধরে হাঁটছে রানা, মাঝেমধ্যেই ওর পিঠে রাইফেলের নল দিয়ে গুঁতো মারছে মংকট। তার বোধহয় ধারণা, ক্ষমতার দাপট দেখানোর জন্য এর প্রয়োজন আছে।

সামনে খোলা দরজা, ভিতরে ঢুকল রানা।

'এটাই তোমার শেষ ঠিকানা, রানা,' বলল মংকট। 'এখান থেকে সরাসরি ভ-ভগবানের কাছে চলে যাবে।'

নিঃশব্দে হাসল রানা। জবাবে ঘোলাটে চোখ জোড়া থেকে ঘৃণা ছড়াল মংকট, বাইরে থেকে দড়াম করে বন্ধ করল কবাট, তারপর তালা মেরে দিল দরজায়।

কামরার ভিতরে একটাই কট, তাতে লম্বা হয়ে শুয়ে বাতাস শুঁকল রানা। হালকা পারফিউম ছাড়াও মেয়েলি একটা গন্ধ পাচ্ছে। উত্তরা আর মোহনাকে সম্ভবত এঘরেই আটকে রাখা হয়েছিল।

প্যাসেজ ধরে বুট জুতোর আওয়াজ এগিয়ে এল, থামল দরজার ঠিক বাইরে। ওকে পাহারা দেওয়ার জন্য গার্ড পাঠিয়েছে মংকট।

রানার সঙ্গে কিছুই নেই, জিকো তানাইয়ের অফিস কামরায় আছে সব–পিস্তল, ছুরি, রেডিও, ব্যাকপ্যাক। কাছে, তবু ওর নাগালের বাইরে।

পরিস্থিতি নিয়ে ভাবছে রানা। ডক্টর নাদিরাকে নিয়ে আসার

জন্য একটু পরেই দুরন্ত ঈগলে উঠবে টেকনিশিয়ানরা। এই হাটের কোনও কামরায় তালা দিয়ে রাখা হবে তাঁকেও, যেহেতু এখানেই রাখা হচ্ছে বন্দিদের।

কতক্ষণ? যতক্ষণ তাঁর সঙ্গে কথা বলবার জন্য রানাকে ডাকা না হয়। ড্রাগসের প্রভাব দূর হতে কয়েক ঘণ্টা লেগে যাবে।

ইতিমধ্যে প্রতিবেশী কোনও দেশ থেকে সীমান্ত পেরিয়ে থাইল্যান্ডে ঢুকে পড়বে চিনা সিক্রেট সার্ভিসের লোক। রানার ধারণা, কয়েকজন দক্ষ অপারেটর নিয়ে নিশ্চয়ই কোনও প্রতিবেশী দেশেই অপেক্ষা করছে ওর প্রিয় বন্ধু লিউ ফুচুং।

রানা আশা করছে, কোনও অঘটন না ঘটলে কাল ভোরের মধ্যে উপত্যকা ঘিরে পজিশন নেবে চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিস। তাদেরকে পথ দেখিয়ে ব্যান সপ দুর্গ এলাকায় নামিয়ে আনবে মোহনা আর মানস।

তবে তার আগে মূল কাজটা ওকেই সেরে ফেলতে হবে। আমেরিকানরা কোনওভাবে যদি বুঝতে পারে থাই টং-এর এই সুরক্ষিত আস্তানা আক্রান্ত হতে চলেছে, মেরে ফেলতে পারে ডক্টর নাদিরাকে। কাজেই হাতে সময় নেই উদ্ধার করতে হবে তাঁকে।

কীভাবে তা সম্ভব এখনও জানে না ও।

চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসের আক্রমণ রক্তবন্যাও বইয়ে দিতে পারে। পাহাড়ের নীচে থাকলেও, রানওয়ের চারপাশে ট্রেঞ্চ কেটে রেখেছে থাই টং, গা ঢাকা দিয়ে পাল্টা গুলি করতে পারবে। চিনা অপারেটরদের সুবিধা একটাই– সারপ্রাইজ।

কট ছেড়ে নামল, হেঁটে এসে দাঁড়াল রানা গরাদ লাগানো জানালার সামনে। নির্দেশ ভোলেনি ভোলা, জানালার বাইরে মাটিতে ঘুমাচ্ছে জিভ বের করে।

'ভোলা!' চাপা গলায় ডাকল রানা। 'এই ভোলা!'

বড়সড় কুকুরটা মুখ তুলল, চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল জানালার দিকে। উঠে দাঁড়িয়ে গা ঝাড়া দিল, হেঁটে চলে এল জানালার কাছে, লেজটা এদিক ওদিক নাড়ছে।

কামরার চারদিকে চোখ বুলাল রানা। কটের কাছে সরে এসে বালিশের কাভারটা খুলে গোল পাকাল, রশি জড়াল ওটার গায়ে, তারপর জানালার সামনে ফিরে এসে বাংলায় বলল, 'আমাকে চেনো তো? তোমার মালিক মানসের বন্ধু আমি। ছুঁড়ে দেয়া জিনিস কীভাবে তুলে আনতে হয়, মনে আছে তো?'

মাথাটা কাত করে কথাগুলো শুনল কুকুরটা, সামনের পা দুটো উঁচু করে জানালার গোবরাটে রাখল, তারপর গলা লম্বা করে মাথাটা ঢুকিয়ে দিল একজোড়া রডের মাঝখানে।

তার কান চুলকে দিল রানা, মাথায় হাত বুলাল, সবশেষে হাতে ধরা কাপড়ের গোল বলটা শুঁকতে দিল। তারপর বলটা জানালার বাইরে ছুঁড়ে দিল। 'আনো, ভোলা।'

বলটার পিছু নিল ভোলা। বলটা নিয়ে রানার কাছে ফিরে এল। ঘন ঘন লেজ নাড়ছে, গর্বে উঁচু হয়ে আছে মাথা।

'গুড বয়,' বলে আবার তার কান চুলকে দিল রানা।

সশব্দে নিঃশ্বাস ফেলছে ভোলা, খুশি মনে লেজ নাড়ছে। এই সময় পায়ের আওয়াজ ভেসে এল। মাথাটা জানালার একধারে সরিয়ে এনে দেখতে চেষ্টা করল রানা কে আসছে।

দৃষ্টিপথে চলে এল উত্তরা, এদিকেই আসছে সে, বারবার কাঁধের উপর দিয়ে পিছনদিকে তাকাচ্ছে।

'কী খবর, উত্তরা?' নিচু গলায় জানতে চাইল রানা।

জানালার সামনে এসে দাঁড়াল উত্তরা। 'রানা, আমার ওপর নজর রাখছে ওরা,' রুদ্ধশ্বাসে বলল, দ্রুত চোখ বুলিয়ে দেখে নিল আশপাশে কেউ আছে কি না। 'এবার বলো, আমার কী...'

'প্রথম কাজ মাথা ঠাণ্ডা রাখা,' বলল রানা। 'ভাব দেখাও ওদের প্রতি সমর্থন আছে তোমার। তারপর চেষ্টা করে দেখো

এখান থেকে আমাকে বের করতে পার কি না।'

'কীভাবে? ঠিক কী চাইছ তুমি?'

প্রথমে ভোলার মাথায় হাত বুলাল রানা, তারপর চাপ দিয়ে বলল, 'সিট ডাউন, ভোলা।'

দু'বার চক্কর দিল ভোলা, তারপর শুয়ে চোখ বুজল।

উত্তরার দিকে তাকাল রানা। 'আমার ধারণা, থাই কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর ডিরেক্টর খোন কায়েন চাও পুরোপুরি অন্ধকারে আছেন। তাঁর অপারেশন্স চিফ সত্যশুভ চুনাভান বা লোকাল আই.বি-এর ভূমিকার কথা কিছুই জানেন না। ছুটিতে থাকলেও, হেডঅফিসের সঙ্গে নিশ্চয়ই যোগাযোগ রাখছেন তিনি। তুমি কোনও মেসেজ পাঠালে অবশ্যই পাবেন।'

'আমি মেসেজ পাঠাব?' অবাক হলো উত্তরা। 'কীভাবে?'

'আমার ব্যাকপ্যাকটা জিকো তানাইয়ের অফিসে আছে,' বলল রানা। 'ওটা যদি নিয়ে আসতে পার, আমার খুব কাজে লাগবে; তুমিও তোমার বস্‌কে মেসেজ পাঠাতে পারবে। ওটায় একটা রেডিও আছে।'

'কী জানি অফিসটায় ঢোকা সম্ভব কি না,' অনিশ্চিত দেখাল উত্তরাকে। 'ঠিক আছে, চেষ্টা তো করি।'

'ব্যাকপ্যাকটা নিয়ে এসো, আমি দেখিয়ে দেব কীভাবে ট্র্যান্সমিট করতে হবে।'

ষোলো

ধীরে ধীরে গড়াচ্ছে সময়। কড়া রোদে অ্যালুমিনিয়ামের ছাদ

তেতে গরম তন্দুর হয়ে উঠল রানার কামরা।

ডক্টর নাদিরার কথা ভেবে দুশ্চিন্তা হচ্ছে ওর, এখনও বন্দি হয়ে আছেন দুরন্ত ঈগলে। মাঝে-মধ্যে গরাদের ফাঁক দিয়ে কামরার ভিতর মাথা ঢোকাচ্ছে ভোলা– একঘেয়েমির শিকার, মনোযোগ আশা করছে। সেদিকে তাকিয়ে দু'একটা কথা বলছে রানা।

শেষ বিকেলের দিকে প্যাসেজে ভারী পদক্ষেপ কানে এল, যেন কিছু বয়ে নিয়ে আসছে কয়েকজন। একটা দরজা খোলা ও বন্ধ হওয়ার শব্দ ভেসে এল। ধাতব ক্লিক আওয়াজ তুলে লেগে গেল তালা। পায়ের শব্দ প্যাসেজ ধরে চলে গেল আবার।

বোধহয় ডক্টর নাদিরাকে রেখে গেল।

আরও এক ঘণ্টা পর ওর খাবার দিল গার্ড। গরুর মাংস আর ছোলার ডাল দিয়ে রান্না করা খিচুড়ি। প্রচণ্ড খিদের কারণে খুব মজা লাগল জিভে, কিন্তু সব না খেয়ে অর্ধেকটা রেখে দিল ও।

নিজের খাওয়া শেষ হতে ভোলাকে ডেকে খাওয়াল।

সন্ধ্যার পর চারদিক ঢাকা পড়ে গেল কালো চাদরে। হঠাৎ জানালার বাইরে থেকে উত্তরার চাপা গলা ভেসে এল।

'রানা, ওটা আমি এনেছি!'

কট থেকে নেমে জানালার সামনে চলে এল রানা। রানওয়ে আর হ্যাঙ্গারের ওদিকে বেশ কয়েকটা ফ্লাডলাইট জ্বললেও ব্যারাকের পিছন দিকে তার আভা খুব কমই পৌঁছেছে। তবে আকৃতি দেখে উত্তরাকে চিনতে পারল ও।

আদর পাওয়ার জন্যই হোক, কিংবা রানার কাছাকাছি কাউকে আসতে দিতে চাইছে না বলে উত্তরার পাঁজরে দুই পা রেখে দাঁড়িয়েছে ভোলা।

'এ তো আমাকে যেতে দিচ্ছে না!'

'সিট ডাউন, ভোলা, সিট ডাউন!'

জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে ভোলা, কথা শুনছে না।

'ওখানে দাঁড়িয়েই মেসেজটা পাঠাতে পার তুমি,' বলল রানা। 'রেডিওটা আগে বের করো।'

ব্যাকপ্যাক খুলে রেডিওটা বের করল উত্তরা।

কীভাবে অন করতে হবে বলে দিল রানা। 'এবার বোতাম টিপে কোড দাও। ওয়ান, জিরো, ওয়ান...' বলে গেল রানা। 'এবার টিসিআই হেডকোয়ার্টারের ফ্রিকোয়েন্সিতে টিউন করে মেসেজটা পাঠাও।'

তিন মিনিট লাগল উত্তরার, উৎফুল কণ্ঠে বলল, 'বস্ নিজে রিসিভ করেছেন আমার মেসেজ! আমার রিপোর্ট শুনে বললেন...'

'কে ওখানে?' থাই ভাষায়, কর্কশ কণ্ঠে জানতে চাইল কেউ।

চমকে উঠে ঘাড় ফেরাল উত্তরা। একটা ছায়ামূর্তি দেখতে পেল ব্যারাকের কোণে। ঠিক তখনই ওকে ছেড়ে ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে গেল ভোলা লোকটার দিকে।

'কে?' ফিসফিস করল রানা।

'বোধহয় কোনও গার্ড...'

'ব্যাকপ্যাকটা জলদি দাও আমাকে...' বলল রানা।

ধুপ করে একটা শব্দ হলো। ঘাড়ে রাইফেলের বাঁটের বাড়ি খেয়ে কেঁউ করে উঠল ভোলা।

'সর্বনাশ!' লোকটা এদিকেই এগিয়ে আসছে দেখে ভয় পেয়ে গেল উত্তরা।

'কেটে পড়ো!' চাপা গলায় তাগাদা দিল রানা। 'তোমাকে যেন চিনতে না পারে!'

আবার গর্জে উঠল ভোলা। কব্জির হাড়ে দাঁত বসতেই এবার কেঁউ করে উঠল গার্ড।

এই সুযোগে রেডিও ও ব্যাকপ্যাক একটা ঝোপ লক্ষ্য করে

ছুঁড়ে দিয়েই ছুটল উত্তরা, মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

'কী হলো?' আরেকটা গলার আওয়াজ পেল রানা। বাজখাঁই।

'কুত্তার বাচ্চা...'

'কী?' এগিয়ে আসছে পায়ের শব্দ।

অবস্থা বেগতিক দেখে কব্জি ছেড়ে কয়েক লাফে মিলিয়ে গেল ভোলা অন্ধকারে।

জানালার কাছ থেকে সরে এসে কটে বসল রানা।

কিছুক্ষণ নিচুগলায় গুজুর গুজুর করল দুই গার্ড, তারপর এগিয়ে এসে দাঁড়াল জানালার সামনে। একজন আহত কব্জি চেপে ধরে অন্ধকার কামরার ভিতরটা দেখবার চেষ্টা করছে।

'কার সঙ্গে কথা হচ্ছিল?' ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে জানতে চাইল অপরজন।

'মর্কট না কী যেন নাম, তার সঙ্গে ,' বলল রানা।

'যেন মনে হলো একটা মেয়েলোক দেখলাম?'

'মর্কটের সঙ্গে ছিল,' বলল রানা।

আর কিছু না বলে চলে গেল গার্ড দুজন। রানা ভাবল, নিশ্চয়ই নিরাপদ দূরত্ব থেকে ওদের চলে যাওয়া দেখছে উত্তরা। ব্যাকপ্যাকটা ওর হাতে তুলে দেওয়ার জন্য নিশ্চয়ই ফিরে আসবে একটু পরেই।

কিন্তু বিশ মিনিট অপেক্ষা করবার পরও এল না উত্তরা।

'ভোলা!' ডাকল রানা।

সাড়া নেই।

আবার ডাকতেই লেজ নাড়তে নাড়তে জানালার গোবরাটে পা তুলল মানসের প্রিয় ডোবারম্যান পিনশার।

কাপড়ের তৈরি বলটা ঝোপ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল রানা। বলল, 'আনো!'

ব্যগ্র ভঙ্গিতে ছুটে গিয়ে বলটা নিয়ে এল ভোলা। তার মাথা

চুলকে দিল রানা।

হাত খালি, কাল্পনিক একটা বল ছুঁড়ল এবার ও, সেই একই ঝোপ লক্ষ্য করে। 'আনো!'

মাথাটা কাত করল ভোলা, প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে পালা করে ঝোপ আর রানার দিকে তাকাচ্ছে।

কুকুরের মাথাটা ঠেলে জানালার বাইরে বের করে দিল রানা। 'আনো!'

কুকুরটা বোকা নয়, অনিশ্চয়তায় ভুগছে। মানুষের গন্ধ আছে এমন জিনিস ওই ঝোপের ভিতর একটা নয়, দুটো– রেডিও আর ব্যাকপ্যাক। হেঁটে গিয়ে দুটোই শুঁকল সে।

'আনো!'

লেজ নাড়ল ভোলা, ঝাঁপিয়ে পড়ে শক্তিশালী চোয়ালে ব্যাকপ্যাক আটকাল, তারপর গর্বিত ভঙ্গিতে রানার কাছে বয়ে নিয়ে এল।

ওটা নিয়ে ভোলাকে আদর করল রানা। সুযোগ পেয়ে চট্ করে ওর গালটা চেটে দিল ডোবারম্যান।

'আনো!' বলল রানা আবার।

বসে পড়ল ভোলা, লম্বা জিভ বের করে হ্যাহ্ হ্যাহ্ করছে। একটা উপকার করে দিতে পেরে খুশি হয়েছে খুব।

'আনো!'

নড়ে না ভোলা। পরবর্তী পনেরো মিনিট চেষ্টা করেও রেডিওটা আনাতে পারল না রানা।

হতাশ হয়ে বিছানায় ফিরে এসে ব্যাগটা হাতড়াল ও। রেডিও আর অস্ত্র নেই ভিতরে, তবে বাকি সব ঠিক আছে। খড় দিয়ে তৈরি গদির নীচে গুঁজে রাখল ব্যাগ।

এবার আড়মোড়া ভেঙে বিছানায় শুয়ে চোখ বুজল রানা। কয়েকটা দিন খুব ধকল যাচ্ছে, উত্তেজিত হয়ে আছে নার্ভগুলো। মিশনটাও পৌঁছে যাচ্ছে পরিণতির দিকে।

কাল সকালে জানতে পারবে এত সতর্কতার সঙ্গে তৈরি করা ওর প্ল্যান সফল হবে, নাকি পা-চাটাদের সাহায্য নিয়ে জিতে যাবে প্রতিদ্বন্দ্বী অশুভ শক্তি।

আকাশ তখনও অন্ধকার, রানার দেহঘড়িতে অ্যালার্ম বেজে উঠল। শান্ত কামরার ভিতর ঘুম ভেঙেছে। কান পাতল ও।

ঝিঁঝি ডাকছে। পাখিগুলোও কিচিরমিচির শুরু করতে যাচ্ছে। জানাচ্ছে, ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই।

তালা দেওয়া দরজার বাইরে করিডরের মেঝেতে পা ঠুকে ঘুম তাড়াবার চেষ্টা করছে নাইট গার্ড, রাতের এই সময়টাই সবচেয়ে সুনসান।

দূরে কোথাও ভেড়ার গলায় বাঁধা ঘণ্টি বেজে উঠল, ভোর হওয়ার আগেই ওগুলোকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে রাখাল।

বিছানায় উঠে বসে নিজের কাজ শুরু করল রানা।

প্রথমে স্ট্রাইয়েটেড টেপ জড়াল জানালার গরাদে, প্রতিটি লোহার রডের আগা ও গোড়ার চারপাশে। টেপের উপর নখের চাপ দিল রানা। চচ্চড় করে মৃদু একটা শব্দ হলো, সঙ্গে সঙ্গে বাতাস ভরে উঠল ওযন-এর ঝাঁঝালো গন্ধে।

জানালার রডগুলো খুলে নিয়ে বিছানার নীচে ঢুকিয়ে রাখল রানা। সূর্য ওঠার আভাস দিয়ে পুব দিগন্ত মাত্র ফরসা হতে শুরু করেছে। টেপটা পকেটে ঢুকিয়ে রেখে ব্যাকপ্যাক পিঠে ঝোলাল ও, তারপর শান্ত পায়ে দরজার কাছে হেঁটে এসে নক করল কবাটে।

'এই, কে! কী চাই?' হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়ায় চমকে উঠে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল গার্ড, ভয় পাচ্ছে প্যাসেজের দু'পাশে যারা ঘুমাচ্ছে তাদের না ঘুম ভেঙে যায়।

'ল্যাট্রিন,' বলল রানা।

এ এমন একটা অনুরোধ, থাই গুণ্ডা ঠিকই বুঝবে। না

বোঝার ভান করেও কোনও লাভ নেই, কারণ কামরার ভিতর জরুরি পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে পরিষ্কার করবার দায়িত্বটা চাপবে তারই ঘাড়ে।

দরজা খুলে গেল।

কামরা থেকে বেরিয়ে এল রানা। প্যাসেজ খালি। দু'পাশের কয়েকটা কামরায় জিকো তানাইয়ের ডান ও বাম হাত ঘুমাচ্ছে, নাক ডাকার আওয়াজ ভেসে আসছে সেগুলো থেকে।

'তোমার সবকিছু ঠিকঠাক আছে তো?' কৃত্রিম উদ্বেগের সঙ্গে ঘুমকাতুরে গার্ডকে জিজ্ঞেস করল রানা। 'অস্ত্র লোড করা, যে-কোনও পরিস্থিতির জন্যে রেডি তুমি?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে হাতের রাইফেলটা একবার দেখে নিল লোকটা। নিজেকে জাগিয়ে রাখতে এত ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে, তার মাথায় অন্য কিছু খেলছে না। মুহূর্তের এই বিভ্রান্তিই দরকার ছিল রানার।

হাতের কিনারা দিয়ে ঘাড়ের পাশে যে কোপটা মারল ও, গার্ডের মনে হলো নিশ্চয়ই বজ্রপাত হয়েছে ওখানে। রাইফেল ছেড়ে দিল সে, মেঝেতে পড়ার আগেই খপ্ করে ধরে ফেলল সেটা রানা।

আঘাতটা সামলে নিয়ে ঘুসি পাকাল গার্ড, তেড়ে এল রানার দিকে। মাথা সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল রানা, নকের পাশে লেগে পিছলে গেল ঘুসিটা।

লক্ষ্য ব্যর্থ হওয়ায় ভারসাম্য হারাল প্রতিপক্ষ। সাহায্য করার ভঙ্গিতে তাকে ধরে ঘোরাল রানা, পেশল বাহু জড়াল গলার চারধারে, তারপর উপর দিকে ঝাঁকি দিল একবার।

শ্বাস-প্রশ্বাস থেমে গেল, বন্ধ হয়ে গেল মগজের সব কাজ। আর খেলবে না সেটা।

মেঝে থেকে তুলল তাকে রানা, নিঃশব্দে বয়ে নিয়ে এল কামরার ভিতর। দেয়ালের দিকে মুখ করে কটে শোয়াল তাকে,

চাদর দিয়ে ঢাকল শরীরটা– যেই দরজা খুলুক, শুধু ঘুমন্ত একজন লোককে দেখতে পাবে।

প্যাসেজে বেরিয়ে এসে নির্দিষ্ট একটা দরজার সামনে থামল রানা, ওর ধারণা কাল রাতে এই কামরাতেই বয়ে নিয়ে আসা হয়েছে ডক্টর নাদিরাকে।

দরজায় তালা দেওয়া। টুথপিকটা বের করে কী-হোলে ঢোকাল ও। একটু পরেই ক্লিক করে আওয়াজের সঙ্গে খুলে গেল তালা। কবাট ফাঁক করে ভিতরে ঢুকল রানা।

ওর কামরার মত, এখানেও ফার্নিচার বলতে শুধু একটা কট। ডক্টর নাদিরার ছোটখাট শরীর ওটার কিনারায় কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে। তাঁর কাঁধে হাত রেখে ফিসফিস করল ও, 'ডক্টর নাদিরা? আমি রানা।'

'ওহ্!' ভয় মেশানো তীক্ষ্ণ আওয়াজ বেরুল বিজ্ঞানীর গলা থেকে।

'চুপচাপ থাকতে হবে, প্লিজ,' জরুরি আবেদনের সুরে বলল রানা। 'তা না হলে আপনাকে অজ্ঞান করতে বাধ্য হব আমি। এবার আর কোনও ঝুঁকি নেয়া যাবে না।'

ওর দিকে তাকিয়ে থাকলেন তিনি, যেন ধাঁধায় পড়ে গেছেন। নরম হাতে বিছানায় উঠে বসতে সাহায্য করল রানা তাঁকে।

ভদ্রমহিলা অত্যন্ত সাহসী। চিন্তাশক্তি ফিরে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করলেন। টলমল করছেন, তবে নিজেই বিছানা থেকে মেঝেতে নামতে গেলেন। 'তুমি... আজ এসেছিলে, নাকি স্বপ্ন...?' স্মরণ করতে পারছেন না।

'কাল।' পড়ে যাচ্ছেন দেখে তাঁকে ধরে ফেলল রানা, দু'হাতের মাঝখানে তুলে নিয়ে কামরার আরেক দিকে চলে যাচ্ছে। 'মনে পড়ে?'

‘হ্যাঁ... বোধহয়।’

দরজা খুলে তাঁকে নিয়ে প্যাসেজে বেরিয়ে এল রানা, তারপর কয়েক পা এগিয়ে ঢুকে পড়ল নিজের কামরায়। ওখানে তাঁকে দাঁড় করিয়ে রেখে প্যাসেজে বেরুল আবার, তাঁর কামরার দরজাটা বন্ধ করে দিল।

নিজের কামরায় ফিরে এসে দরজা লাগাল রানা, ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল, মেঝেতে বসে পড়েছেন ডক্টর নাদিরা, ভারী নিঃশ্বাসের সঙ্গে বিড়বিড় করে কী সব বলছেন।

‘আসুন,’ বলল ও। ‘আপনি পালাচ্ছেন।’

‘সত্যি?’ অস্ফুটে জানতে চাইলেন বিজ্ঞানী।

আবার তাঁকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল রানা, জানালার সামনে চলে এল। ‘প্রথমে আপনাকে বেরিয়ে যেতে সাহায্য করব,’ ব্যাখ্যা করল ও। ‘আপনি জানালার পাশে আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন। ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। আপনার ঠিক পেছনেই থাকব আমি।’

প্রথমে ডক্টর নাদিরার পা দুটো জানালার বাইরে বের করে দিল রানা। তাঁর মাথার উপর দিয়ে দেখতে পেল, হালকা গোলাপি রঙ ধরতে শুরু করেছে পুবের আকাশ।

ঘুমন্ত উপত্যকায় একটু পরেই শুরু হয়ে যাবে মরণ পণ লড়াই। তিন অক্ষরের এই শব্দটা আজও কত প্রাণ কেড়ে নেবে, কে জানে। রানা আশা করছে, চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসের অপারেটররা এরইমধ্যে থাই টং-এর শক্ত ঘাঁটিটা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে।

সকাল হচ্ছে, এখন তারা চুপিসারে এগোবে, কাজে লাগাবে স্যাবটাজের প্রতিটি সুযোগ। তারপর শুরু হবে বন্দুকযুদ্ধ। সবশেষে আনআর্মড কমব্যাট। এভাবেই প্ল্যানটা তৈরি করেছে ও।

চিনা বন্ধুরা যখন ব্যস্ত রাখবে টং গার্ড আর শ্বেতাঙ্গ

কমান্ডোদের, নিজের টিম নিয়ে প্লেনটা দখল করবে রানা। ওর টিম বলতে নিজেকে ছাড়া আরও তিনজন– মানস, উত্তরা ও মোহনা। যে-কোনও মুহূর্তে ওদেরকে দেখতে পাবে বলে আশা করছে ও।

বন্দুকযুদ্ধ, জিম্মি, ছুটোছুটি আর বিভ্রান্তির মধ্য দিয়ে ডক্টর নাদিরাকে নিয়ে প্লেনে ওঠার পথ করে নেবে ওরা।

ফুচুংকে বলা হয়েছে, রানওয়ে পরিষ্কার করবার দায়িত্বটাও তাদেরকেই নিতে হবে, প্লেনটা যাতে নিরাপদে আকাশে উঠে যেতে পারে।

কাজের সহজ একটা সিরিজ, তবে যে-কোনও পয়েন্টে কেঁচে যেতে পারে। সবই এখন অনিশ্চিত।

'এই ছেলে বলছে আমি পালাচ্ছি,' বিড়বিড় করলেন ডক্টর নাদিরা। 'পালাচ্ছি পায়ে হেঁটে...সত্যি বলতে কী, আসলে ওর কোলে চড়ে।'

'আপনাকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে,' বলল রানা। ডক্টর নাদিরা নীচের মাটিতে পা রাখবার চেষ্টা করছেন, তাঁকে সাহায্য করছে ও। 'আপনার ডেভেলাপ করা দুরন্ত ঈগলে চড়েই বেইজিঙে যাচ্ছি আমরা।'

'চিনে কেন?' সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইলেন ডক্টর নাদিরা। 'বাংলাদেশে নয় কেন? দুরন্তকে নিয়ে এখনও কিছু কাজ বাকি আছে আমার...'

'চিনে যাচ্ছি নিরাপত্তার খাতিরে,' বলল রানা। 'ওরা আপনার জন্যে সব রকম ফ্যাসিলিটির ব্যবস্থা করে রেখেছে, যখন খুশি আবার কাজ শুরু করতে পারবেন।' জানালার গোবরাটে উঠল ও।

চোখ তুলে ভাল করে রানাকে দেখলেন ডক্টর নাদিরা। মুখে কদিনের না কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মাথাভর্তি এলোমেলো চুল, সাদা পপলিনের শার্টের উপর ছাই রঙা জ্যাকেট, কোমরে

সাদাটে জিনস। ‘গুড, ভেরি গুড,’ আয়োজন সম্পর্কে মন্তব্য করলেন তিনি। ‘অ্যান্ড ভেরি স্মার্ট, ইনডিড!’ শেষটুকু প্রশংসা।

গোবরাট থেকে নামছে রানা।

হঠাৎ করে জেগে উঠল ভোলা। বিস্মিত কুকুরটা সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পেল ডক্টর নাদিরাকে। অচেনা মানুষ, আগন্তুক।

ঘেউ করে ডেকে উঠল ডোবারম্যান।

‘ভোলা!’ কড়া সুরে ধমক দিল রানা, মাটিতে নেমে ঘুরে দাঁড়াল। ‘চুপ!’

রানাকে লক্ষই করছে না কুকুরটা, তার দৃষ্টি বিঁধে আছে দেয়ালে পিঠ সাঁটিয়ে দাঁড়ানো ডক্টর নাদিরার উপর। থরথর করে কাঁপছেন তিনি।

পিলে চমকানো শব্দে ঘেউ করে উঠল ভোলা, তাঁকে লক্ষ্য করে লাফ দিল।

ঘুরে দাঁড়িয়ে রক্ত ছলকানো একটা চিৎকার দিলেন ডক্টর নাদিরা, হাত দুটো গলায় উঠে গেছে, চেষ্টা করছেন দেয়ালে মুখ গুঁজে দেওয়ার।

ঝট্ করে হাত বাড়িয়ে ভোলার কলারটা ধরে ফেলল রানা। বাধা পেয়ে আবার গর্জে উঠল শক্তিশালী কুকুরটা। ডক্টর নাদিরার নার্ভে চোট লেগেছে, আরও জোরে চিৎকার করছেন তিনি।

প্রথমে প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড হাটগুলো থেকে হইচই শুরু করল লোকজন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রানওয়ের দু’পাশে ফেলা তাঁবুর ওদিক থেকে হাঁক-ডাক ভেসে এল। তারপর দূর থেকে ভেসে এল ঠুস-ঠাস গুলির শব্দ। কী হচ্ছে বুঝতে না পেরে নিশ্চয়ই কোনও গার্ড ফাঁকা গুলি শুরু করেছে।

কিন্তু না, একজন নয়, কয়েকজন... বহু লোক...চারদিক থেকে...

হঠাৎ রানা উপলব্ধি করল, কুকুরের গর্জন আর ডক্টর

নাদিরার চিৎকারের সঙ্গে আসলে লোকজনের হইচই আর গুলিবর্ষণের কোনও সম্পর্ক নেই।

থাই টং-এর বিশাল আস্তানার চারদিক হঠাৎ করে যেন একসঙ্গে জেগে উঠছে। কেউ বোধহয় এখনও পরিষ্কারভাবে জানে না কী হচ্ছে। রানার ধারণা, ও জানে।

তবে ওর জন্যও অপেক্ষা করছে বিস্ময়।

'ধুস্ শালা!' রাগে ও হতাশায় অসহায় বোধ করছে রানা। 'ভোলার বাচ্চা, চুপ!'

অনেক দেরি হয়ে গেছে, তবে কুকুরটা থামল, ক্ষমা পাওয়ার আশায় রানার হাত চাটছে। দেয়ালে ঘষা খেয়ে মাটিতে বসে পড়লেন ডক্টর নাদিরা, ফোঁপাচ্ছেন।

হইচই আর হাঁক-ডাক আরও বাড়ছে। নতুন মাত্রা যোগ হলো– আর্তনাদ! চারদিক থেকে ভেসে আসছে আহত লোকজনের কাতরানি।

শুধু গুলি নয়, এবার পাল্টা গুলিও শুরু হয়ে গেল।

একদল আমেরিকান কমান্ডো কুইক মার্চ করে হ্যাঙ্গারের দিকে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে থেকে কেউ একজন চিৎকার শুরু করল: 'কমান্ডার ডুগার্ড ম্যাকমোহন, সার! আমরা আক্রান্ত হয়েছি! চারদিক থেকে...'

দেড়-দুশো জোড়া বুট জুতোর আওয়াজ আরও কাছে চলে আসায় বাকিটা আর শোনা গেল না।

'আসুন!' ডক্টর নাদিরাকে কাঁধে তুলে নিল রানা। ঠিক সেই মুহূর্তে গরাদবিহীন জানালা দিয়ে প্রথমে বাইরে মাথা বের করল জুতনা মংকট, তারপর বেরোল তার পিস্তল ধরা হাতটা। রানাকে দেখামাত্র গুলি করল সে। তার আগেই দৌড় দিয়েছে রানা। ছুটতে ছুটতে কয়েকটা গাছের পিছনে চলে গেল।

গাছগুলোর আড়াল পেয়ে সতর্কতার সঙ্গে বেশ কিছুটা এগোল রানা। বাঁক ঘুরল দু'বার, একটা খালি তাঁবুর পিছনে

থেমে পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করছে।

চারদিক থেকে পিছু হটে নিজেদের তাঁবুর কাছে ফিরে আসছে সশস্ত্র টং বন্দুকবাজরা। প্রত্যেকের চোখে-মুখে আতংক। তাদের মধ্যে থেকে একজন বলল, 'আউটসাইড পেরিমিটারে একজন গার্ডও বেঁচে নেই!'

আরেকজন বলল, 'এইমাত্র আহত একজন গার্ড রেডিওতে জানাল, নদীর ঘাটে থাই সোলজার গিজগিজ করছে। ট্রাকের একটা কনভয় নিয়ে আসছে তারা।'

মিলিটারি পুলিশের কয়েক সারি তাঁবুর বাইরে আশ্চর্য এক কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। প্রায় দেড়-দুশো নকল মিলিটারি পুলিশ কে কোন্‌দিকে যুদ্ধ করতে যাবে সেই নির্দেশ পাওয়ার অপেক্ষায় ছিল, থাই সৈন্যের কনভয় আসছে শুনে হঠাৎ তারা যে যার ইউনিফর্ম খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। স্বচক্ষে না দেখলে কাউকে বিশ্বাস করানো মুশকিল যে, অতগুলো লোক কে কার আগে উলঙ্গ হবে তারই প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছে!

রানা ধারণা করল, উত্তরার মেসেজে কাজ হয়েছে– নিশ্চয় থাই ইন্টেলিজেন্স চিফের অনুরোধেই মিলিটারি পাঠাচ্ছে থাই সরকার। শাস্তির মাত্রা কম হওয়ার আশায় টং গুণ্ডারা ইউনিফর্ম খুলে ফেলছে।

রানার পিছনে, পাহাড়ি ঢালের উপর, আই.বি লোকাল এজেন্টদের কয়েকটা লাশ পড়ে রয়েছে। দূরে, রানওয়ের উপর, ট্রেসার বুলেট ছুটোছুটি করছে। ওখানে চিনা সিক্রেট সার্ভিসের অপারেটরদের সঙ্গে থাই টং ও আই.বি লোকাল এজেন্টদের তুমুল লড়াই হচ্ছে। রানা দেখল, রানওয়ের একটা অংশ এরইমধ্যে পরিষ্কার করা হয়ে গেছে, এমনকী রানওয়ের পাশে যে তাঁবুগুলো ছিল সেগুলোতেও আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, ওখানে যাতে কেউ লুকিয়ে থাকতে না পারে।

দুরন্ত ঈগলে উঠতে হলে কাঁটাতারের বেড়া টপকে

হ্যাঙ্গারটার সামনে যেতে হবে রানাকে। কীভাবে তা সম্ভব ভাবছে ও।

'রানা? মাসুদ রানা?' ওর কাঁধ থেকে ডাকলেন ডক্টর নাদিরা। 'তুমি বাপু আমাকে এবার মাটিতে নামাবে নাকি?'

ভদ্রমহিলার কাঁপুনি থেমেছে, তবে রানাকে এখন দ্রুত এগোতে হবে। বোঝাটা কাঁধে অ্যাডজাস্ট করে নিয়ে বলল, 'একটু পরে।'

পা চালিয়ে এগোল রানা। আরও দুটো তাঁবুর মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে এসে এগোচ্ছে সাতটনী একটা ট্রাকের দিকে। ওর গলাটা শক্ত করে পেঁচিয়ে ধরেছেন বিজ্ঞানী। ট্রাকের পিছনের চাকার পাশে তাঁকে নামাল ও, বলল, 'এখানে অপেক্ষা করুন, কোথাও যাবেন না।'

'এক চুল নড়ব না,' বললেন তিনি। 'ভাল কথা, ধন্যবাদ। এরইমধ্যে যা করেছ, এরচেয়ে বেশি কিছু কারও কাছ থেকে আশা করা যায় না।'

তাঁর কথায় কান নেই রানার, মাটিতে শুয়ে ক্রল শুরু করল। ট্রাকের তলায় ঢুকে সাবধানে এগোচ্ছে ও, ওর টার্গেট একজোড়া পা।

সাদা জুতো জোড়া চেনে রানা।

'আমি জা-জানি আশপাশেই কোথাও আছে বেজন্মা কু-কুত্তাটা!' রাগে হিসহিস করে উঠল মংকট। 'তাকে আ-আমি চাই। যেভাবে হোক খুঁজে বের ক-করো!'

তিন জোড়া পা তিনদিকে ছুটল।

'এ-এখানে আমি অ-অপেক্ষা ক-করব!' যত খেপছে ততই বেশি তোতলাচ্ছে মংকট।

দশ পর্যন্ত গুণল রানা, হাত দুটো পরস্পরের সঙ্গে ঘষল, তারপর মংকটের গোড়ালি ধরে হ্যাঁচকা টান দিল।

ধুলোর মেঘ উড়িয়ে আছাড় খেল লোকাল আই.বি হেড।

চিৎকার করবার সময় পেল না, প্রচণ্ড শক্তিতে ট্রাকের নীচে টেনে নিল তাকে রানা।

পা ছুঁড়ল মংকট, তবে কোথাও লাগাতে পারল না। তারপর শরীরটাকে ধনুকের মত বাঁকিয়ে মোক্ষম একটা ঘুসি চালাল রানার চোয়াল লক্ষ্য করে।

ঝিন ঝিন করছে মাথার ভিতরটা, বমি পাচ্ছে, তারপরও খালি হাতটা দিয়ে মংকটের চোয়াল গুঁড়িয়ে দিল রানা।

মাথা ঝাঁকাল মংকট। অত্যন্ত কঠিন পাত্র, রাগে চোখ দুটো জ্বলছে তার।

দুজনেই পাশ ফিরে শুয়ে আছে ওরা, প্রত্যেকের মাত্র একটা করে হাত মুক্ত।

হঠাৎ সাপের মত ছোবল মারল রানা। মংকটের গলার কাছে শার্টের কলার চেপে ধরেছে। জবাবে রানার চোখে আঙুল ঢোকাবার চেষ্টা করল মংকট। মাথাটা সরিয়ে নিয়ে চোখ বাঁচাল রানা, তারপর নিতম্ব আর কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে মুঠোয় ধরা কলারটায় ঝাঁকি দিল। মংকটের মাথাটা সবেগে বাড়ি খেল ট্রাকের অ্যাক্সেল-এ।

শরীরের পাশে স্থির হয়ে গেল মংকটের হাত। চোখ দুটো বিরাট হয়ে উঠেছে। থেঁতলানো মুখের কয়েক জায়গা থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। 'শি-শিট!' গালি দিল সে।

'সব দিন এক রকম যায় না,' মন্তব্য করল রানা, পরমুহূর্তে তার ভাঙা চোয়ালে প্রচণ্ড গুঁতো মারল ভাঁজ করা হাতের কনুই দিয়ে।

গুঙিয়ে উঠে জ্ঞান হারাল মংকট। তার উপর দিয়ে ক্রল করে ট্রাকের তলা থেকে বেরিয়ে এল রানা, ঠিক যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল লোকটা। তার একে-ফোরটিসেভেনটা তুলে নিল মাটি থেকে। ক্রল করে আবার ঢুকল ট্রাকের তলায়, চলে এল ডক্টর নাদিরার পাশে।

নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে ট্রাকের নীচে লুকিয়েছেন তিনি।

'এবার আমরা আপনার দুরন্ত ঈগলে পৌঁছাবার চেষ্টা করব,' বলল রানা। ট্রাকের তলা থেকে বেরুতে সাহায্য করল তাঁকে।

ডক্টর নাদিরাকে ছেড়ে দিয়ে ধীরে ধীরে সিধে হলো রানা। তারপর হঠাৎ কান পাতল। দেখল– ও একা নয়, ওর মত আরও দু'চারজন কী যেন শোনার চেষ্টা করছে।

বাতাসে কীসের যেন কম্পন। তারপর গুরু-গম্ভীর একটা আওয়াজ, যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে। আকাশে চোখ বুলাল রানা। পরিষ্কার আকাশ, একটা চিল পর্যন্ত নেই কোথাও।

কয়েক সেকেন্ড পর কালো মেঘের মত কী যেন দেখা গেল এক কোণে। না, চারকোণেই। আর, মেঘও নয়। কালো রঙ করা হেলিকপ্টার গানশিপ, ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসছে, ঢেকে দিচ্ছে উপত্যকার গোটা আকাশ।

পরমুহূর্তে গোটা উপত্যকা সনিক বুম-এ কেঁপে উঠল। চিনে তৈরি এক ঝাঁক জেট ফাইটার ছুটে গেল মাথার উপর দিয়ে।

হেলিকপ্টার গানশিপগুলোকে ভাল করে দেখবার জন্য ট্রাকের আড়াল থেকে বেরুতে যাচ্ছে রানা। কোণটা মাত্র ঘুরেছে, দেখল, পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের একটা টিমের সামনে পড়ে গেছে। মানসকে সামনে নিয়ে ওর দিকেই এগিয়ে আসছে খুনিরা। তাদের অন্তত একজনকে চিনতে পারল ও।

তবে রানাকে দেখতে পায়নি তারা, চেষ্টা করলে এখনও বোধহয় পিছিয়ে ট্রাকের আড়ালে ফিরে আসা যায়।

সতেরো

পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর টিমে চারজন এজেন্ট রয়েছে। তাদের মাঝখানে অতি নগণ্য ও নিষ্প্রভ একটা চরিত্র হিসাবে দেখা যাচ্ছে মানস ঘোষকে।

মোহনাকে নিয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচে নামবার সময় পিসিআই-এর হাতে বন্দি হয়েছে মানস। মোহনাও ধরা পড়ত, ভাগ্যক্রমে সে অনেকটা পিছনে ছিল বলে বেঁচে গেছে।

ধরা পড়বার পর পাকিস্তানী এজেন্টরা তাকে নির্দেশ দিয়েছে, হয় পথ দেখিয়ে দুরন্ত ঈগলের কাছে নিয়ে চলো আমাদেরকে, নয়তো দেখিয়ে দাও মাসুদ রানা কোথায় আছে। তাদের ধারণা, রানা জানে কীভাবে ঈগলের কাছে পৌঁছানো যাবে, কাজেই তাকে ধরতে পারলেই তাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়।

তাদের হুকুম মত কাজ না করলে মানসকে এই মুহূর্তে মেরে ফেলা হবে, জানিয়ে দিয়েছে পিসিআই এজেন্টরা।

প্রাণ বাঁচানো ফরজ, তাই মানস ওদেরকে বলেছে, মাসুদ রানাকে কোথায় পাওয়া যাবে সে জানে, সেখানে নিয়ে গিয়ে হাত তুলে দেখিয়ে দেবে তাকে।

পাকিস্তানী এজেন্টরাও কথা দিয়েছে বিনিময়ে ইন্ডিয়ান শত্রু ও কাফের হওয়া সত্ত্বেও মানসকে ওরা ছেড়ে দেবে। যদিও পাকিস্তানীরা কথা রাখবে কি না সে-ব্যাপারে প্রবল সন্দেহ আছে মানসের।

পাহাড়ের ঢালে টং সেন্ট্রিদের মেরে সাফ করে ফেলেছে চিনা সিক্রেট সার্ভিসের অপারেটররা, সেই সুযোগে সরু ট্রেইল ধরে নীচে নেমে এসেছে পিসিআই এজেন্টরা। সে-ও প্রায় আধ ঘণ্টা হতে চলল।

'কোথায় মাসুদ রানা?' খুনিদের একজন জানতে চাইল। 'তুমি আমাদেরকে শুধু শুধু চক্কর খাওয়াচ্ছ নাকি? এই জায়গা

দিয়ে খানিক আগেও গেছি আমরা...'

'এই তো, এদিকেই কোথাও আছে সে,' বলল মানস।

'কোথাও আছে কথাটার মানে কী?' স্কোয়াড লিডার জানতে চাইল। 'পরিষ্কার আলাপ হয়নি, ঠিক কোথায় তার সঙ্গে তোমার দেখা হবে?'

'তা তো হয়েছেই,' বলল মানস। 'কিন্তু...'

ওদের ডানদিকে কয়েকটা সাত ও পাঁচটনী ট্রাক দেখা যাচ্ছে। কেউ লুকিয়ে আছে কি না দেখবার জন্য সেগুলোর দিকে এগোল ওরা।

পাহাড়ের ঢালের উপর চোখ পড়তে থেমে গেল মানস। দুশো ফুট উপরে থাকলেও, বাদামি রঙের সুট দেখে লোকগুলোকে চিনতে কোনও অসুবিধে হলো না ওর। তাদের সঙ্গে রয়েছে, এমন কয়েকজনের ইউনিফর্মও ওর পরিচিত–ভারতীয় টিম।

টিমের সবাই চোখে বিনকিউলার তুলে দেখছে তাকে। তাদের একজন ওকে আশ্বস্ত করবার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মানস। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে সামনে তাকাল ও। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল ভূত দেখার মত।

ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা।

একটা পাঁচটনী ট্রাকের পিছন থেকে বেরিয়ে এল রানা। প্রথমে ডানে, তারপর বামে তাকাল। ওর মুখে কদিনের না কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মাথায় এলোমেলো একরাশ চুল, সাদা পপলিনের শার্টের উপর ছাই রঙা জ্যাকেট, কোমরে সাদাটে জিনস।

মানসের চোখে যেন একটা অপার্থিব আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল। ইশারায় পিসিআই এজেন্টদের দেখাল। 'ওই তো,' ফিসফিস করল ও। 'মাসুদ রানা।'

ত্রিশ কি পঁয়ত্রিশ ফুট দূরে রানা। চারজন লোকের মাঝখানে মানসকে দেখামাত্র তার বিপদ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল ও। ওরা যে পিসিআই এজেন্ট, তা আর বুঝতে বাকি থাকল না ওর।

মানসের দিকে একটা হাত তুলল রানা, যেন নিজের দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে।

ওদিকে পিসিআই এজেন্টরা যে যার হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করছে।

এরপর ঠিক বোঝা গেল না কীভাবে কী হলো। হঠাৎ আগুন ধরে গেল মানসের দু'পাশে দাঁড়ানো পিসিআই এজেন্টদের কাপড়ে। আগুন ছড়াতে যে সময় লাগে, এখানে তা লাগল না। প্রত্যেকের পুরোটা শরীর একসঙ্গে জ্বলে উঠেছে। তাদের বিস্ময় ও আতংকিত আর্তচিৎকারে ভারী হয়ে উঠল আশপাশের বাতাস। হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে আগুন নেভাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল তারা। দু'একজন পরনের কিছু কাপড় খুলে ফেলতেও পারল। কিন্তু নতুন করে আগুন লাগল সেখানে, কাপড়ের বদলে গায়ের চামড়ায়!

অদ্ভুত ব্যাপার হলো, মানস সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায়, হাসতে হাসতে হেঁটে আসছে রানার দিকে, আগুনের একটা শিখাও ওকে স্পর্শ করেনি। ওর হাতে একটা পিস্তল রয়েছে, এই মাত্র মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়েছে।

সোজা হেঁটে এসে রানার সামনে দাঁড়াল মানস। তার ঠোঁটে বিষণ্ন এক চিলতে হাসি। হাতের পিস্তলটা ঝট করে তুলে রানার কপালে ঠেকাল সে, তারপর ওকে কোনও সময় না দিয়ে টিপে দিল ট্রিগার।

রানার মাথাটা মুহূর্তে বিস্ফোরিত হলো। লাশটা পড়ে যাচ্ছে, লাফ দিয়ে একপাশে সরে গেল মানস। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে পাহাড়ের দিকে তাকাল।

ভারতীয় টেকনিকাল টিমকে হঠাৎ করে অস্থির হয়ে উঠতে

দেখল মানস। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে দ্রুত নেমে আসছে তারা।

তবে চিনা সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্টরা তাদের পিছু নিয়েছে।

ব্যান সপ দুর্গের মাথায়, রানওয়ের পাশের খোলা মাঠে, আর হ্যাঙ্গারের দু'পাশে একে একে ল্যান্ড করছে চিনা এয়ারফোর্স-এর হেলিকপ্টার গানশিপ। পাইলটরা খুব সাবধানী, কেউ তাড়াহুড়ো করছে না।

ফাইটার জেটগুলো এখনও চক্কর দিচ্ছে আকাশে, সাউন্ড ব্যারিয়ার ভেদ করবার সময় কান ফাটানো আওয়াজ করছে মাঝে-মধ্যেই।

এবার উপত্যকার মাথায় উড়ে এল বেশ কয়েকটা পেটমোটা ট্রুপস ক্যারিয়ার। পরিষ্কার আকাশের গায়ে কালো বিন্দুর মত লাগছে চিনা ছত্রিসেনাদের, ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে আসছে ট্রুপস ক্যারিয়ারের পিছন থেকে। উপত্যকার সব জায়গায় নেমে আসছে প্যারাশুটগুলো, চাইনিজ কমান্ডোদের হাতে চাইনিজ স্টেন ও মেশিন-পিস্তল।

হঠাৎ লাউডস্পিকার থেকে একটা ঘোষণা ভেসে এল। ভাষাটা চিনা আর যান্ত্রিক, তবে কণ্ঠস্বরে কর্তৃত্ব ও দৃঢ়তার কোনও অভাব নেই। 'চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর লিউ ফুচুং বলছি। আমেরিকানদের প্রতি আমার নির্দেশ, ভাল চাও তো তোমরা যে যার হাতের অস্ত্র ফেলে দাও।'

কয়েক সেকেন্ড কিছুই ঘটল না। শত্রুরা বোবা হয়ে আছে।

তারপর আবার লিউ ফুচুং-এর নির্দেশ ছড়িয়ে পড়ল বিশাল টং আস্তানার চারপাশে, এবার সুরটা আরও কঠিন: 'হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে শুয়ে পড়ো তোমরা। এটাই শেষ নির্দেশ। এরপর...'

হঠাৎ অন্য একটা লাউডস্পিকার জ্যান্ত হয়ে উঠল। 'আমি

ইউ.এস.এয়ারফোর্সের অপারেশন্স চিফ, কমান্ডার ডুগার্ড ম্যাকমোহান। আমি জানতে চাইছি—আমাদের কী হবে?'

ফুচুং জবাব দিল, 'আমাদের জিনিস আমরা ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, ব্যস। তোমরা আঙুল চুষতে চুষতে বাড়ি ফিরে যাও।'

ফুচুং থামতেই বজ্রকণ্ঠে নির্দেশ দিল ডুগার্ড ম্যাকমোহন: 'গ্রিন বেরেট, অ্যাটেনশন! নাসা অফিশিয়াল আর থাই টং, অ্যাটেনশন! তোমরা যে-যার সমস্ত অস্ত্র ফেলে দাও! দ্যাট'স অ্যান অর্ডার! এবং তারপরেই যে-যেখানে আছ শুয়ে পড়ো! আই রিপিট...'

চারদিকে গিজগিজ করছে চিনা সৈন্য, ওদিকে ট্রাক বহর নিয়ে কাছে চলে আসছে থাই সৈন্যরাও, এরকম একটা পরিস্থিতিতে কার সাহস হবে বীরত্ব দেখাবার! দ্বিতীয়বার বলবার প্রয়োজন হলো না, যে যেখানে ছিল হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে সেখানেই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল।

*

চিনা এজেন্টদের সঙ্গে ভারতীয় টিমের কী সমঝোতা হলো মানস জানে না, তবে দেখতে পেল টিমের সবাই ঢাল বেয়ে ওর দিকে হেঁটে আসছে। এখনও অনেকটা দূরে তারা, ওর কাছে পৌঁছাতে বেশ কিছুটা সময় লাগবে।

'দাদা, এবার আপনি বেরিয়ে আসতে পারেন!' হঠাৎ গলা চড়িয়ে বলল মানস ঘোষ।

এক কি দু'সেকেন্ড পর আড়াল থেকে বেরিয়ে, উদয় চৌধুরীর লাশটা টপকে, রানাকে ওর দিকে হেঁটে আসতে দেখছে মানস। কাঁধে ডক্টর নাদিরা রয়েছেন, তাই সাবধানে এগোচ্ছে সে।

পিসিআই এজেন্টরা আর উদয় চৌধুরী কীভাবে মারা গেল, পরিষ্কার দেখেছে রানা।

পাকিস্তানীরা দেখতে পায়নি ওকে, এটা বুঝতে পেরে পিছাতে শুরু করেছিল ও, হঠাৎ দেখতে পেয়েছে সামনের অন্য

একটা ট্রাকের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে এক লোক।

লোকটা প্রথমে ডানে, তারপর বামে তাকিয়েছে। তার চেহারা আর বেশভূষা দেখে চমকে উঠেছে রানা। এত মিল গাঁজাখুরি গল্পেও সাধারণত পাওয়া যায় না– মুখে কদিনের না কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মাথায় এলোমেলো একরাশ চুল, সাদা পপলিনের শার্টের উপর ছাই রঙা জ্যাকেট, কোমরে সাদাটে জিনস।

ডানে-বামে তাকালেও, রানাকে দেখতে পায়নি ওর কার্বনকপি। একই চেহারা নিয়ে ওই লোক যে ওর বা ডক্টর নাদিরার কোনও উপকার করতে আসেনি, সেটা বুঝতে দেরি হয়নি ওর। পিছিয়ে ট্রাকের আড়াল চলে এসেছে ও, ডক্টর নাদিরার পাশে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে দেখেছে কী হচ্ছে।

মানস জানে, তার বিপদটা মারাত্মক। এসপিওনাজে এরচেয়ে বড় অপরাধ আর হয় না। টপ বস্ রমেশ ঠাক্রের নির্দেশ ছিল, মঞ্চ থেকে রানাকে আউট করে দিয়ে ওর কার্বনকপি উদয়কে ইন করাতে হবে। সেই নির্দেশ শুধু অমান্য করেনি ও, নিজেদের লোককে গুলি করে মেরে ফেলেছে। কাজেই ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসে ওর ক্যারিয়ার শেষ।

মানসের উপর ঠিক কী নির্দেশ ছিল রানা তা জানে না, তবে আন্দাজ করে নিতে অসুবিধে হয়নি ওর।

উদয়কে খুন করবার আগে রানার একটা উপকারও করেছে মানস। উদয়কে দিয়ে পাকিস্তানী চার খুনিকে পরপারে পাঠিয়ে দিয়েছে। উদয় প্রায় হুবহু রানার মত দেখতে হলেও, তার একটা হাত নেই। সেখানে কৃত্রিম একটা হাত ফিট করা ছিল, হাতের মত দেখতে অত্যাধুনিক লেযার গান। উদয়কে হাত লম্বা করতে দেখেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে রানা।

আর উদয় যে উদয়ই, রানা নয়, এটা মানস বুঝতে পারে দুটো জিনিস দেখে– উদয় তার এক কানে রিঙ পরে, এবং

রানার চেয়ে ইঞ্চি দেড়েক কম লম্বা সে।
মার্কিন এয়ারফোর্স-এর কর্মকর্তা ডুগার্ড ম্যাকমোহানের ঘোষণা শুনেছে রানা, এই মুহূর্তে ডক্টর নাদিরাকে নিয়ে মানসের দিকে এগিয়ে আসছে।
'মাসুদ ভাই!'
ঘাড় ফিরে তাকাতেই মোহনাকে দেখতে পেল রানা, পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে আসছে। তার সঙ্গে উত্তরাও রয়েছে। হাতের একে-ফোরটিসেভেনটা একটু উঁচু করে তাদের উদ্দেশে নাড়ল ও।
'নমস্তে, সার! সেলাম, হুজুর!'
সামনে মানস রয়েছে জানে রানা, তারপরেও ওর কণ্ঠস্বরে এমন কিছু আছে, ঝট্ করে ঘাড়টা সিধে করল।
সেই সঙ্গে আজ দ্বিতীয়বারের মত চমকাতে হলো ওকে।
হাতের পিস্তলটা নিজের কপালে ঠেকিয়ে রেখেছে মানস। চোখাচোখি হতেই বিষণ্ন এক চিলতে হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে। 'বিদায়, ওস্তাদ! যাবতীয় অপরাধ আর বেয়াদবি নিজ গুণে ক্ষমা করে দেবেন!'
কীভাবে যেন বুঝে ফেলল রানা, ও স্বপ্ন দেখছে না। কীভাবে যেন সহজ যোগ অঙ্কটাও মিলিয়ে ফেলল– ওকে মেরে ফেলার নির্দেশ অমান্য করায়, ওর বদলে কার্বনকপিকে খুন করায়, মানসের সামনে এখন আর আত্মহত্যা করা ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই।
'না!' নিষেধ নয়, নয় অনুরোধও, মহৎপ্রাণ মানুষটির প্রতি ভালবাসার অধিকার থেকে আদেশ করল রানা। 'না, মানস, না!'
খালি হাতটা তুলে দেখাল মানস। ভারতীয় টেকনিকাল টিম এখন আর হাঁটছে না, ছুটে আসছে ওর দিকে। তবে তাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে চিনা সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্টরা।
রানাও দেখল তাদেরকে। 'ওদেরকে আমি ঠেকাব,' কথা

দিল রানা। 'আপনি জানেন গোটা এলাকা এখন আমার বন্ধুদের দখলে। কেউ আপনার গায়ে একটা টোকাও দিতে পারবে না...'

মাথা নাড়ল মানস। 'বুঝলাম, আপনি আমাকে বাঁচাতে পারবেন। কিন্তু আমার ভোলার কী হবে? আমাকে ইন্টারোগেট করার সময় প্রথমেই ওকে ওরা মেরে ফেলবে। আমার মা আর দিদির কী হবে? ভেবেছেন আমি বেঁচে থাকলে ওরা তাদেরকে ছাড়বে, টরচার করে খুন করবে না?'

পিস্তলটা কপাল থেকে নামিয়ে মুখে পুরল মানস, তারপর টিপে দিল ট্রিগার।

এতক্ষণ কোথায় ছিল কে জানে, হঠাৎ ছুটে এসে কয়েকবার ডেকে উঠল ভোলা, তারপর কাত হয়ে মাটিতে পড়ে থাকা মনিবের পাশে পাহারায় বসল।

মাঝে-মধ্যে লাশটার গন্ধ শুঁকছে ওটা, ওর বুকপকেটে পোরা রানার রুমালটা শুঁকছে। সবই বুঝে ফেলল ও, তারপর আকাশের দিকে মুখ তুলে নালিশ জানাল; করুণ, লম্বা সুরে কেঁদে উঠল অবুঝ পশু। যেন বলছে, ফিরিয়ে দাও আমার মনিবকে!

রানার মত অবোধ প্রাণীটিও এই অকাল মৃত্যু মেনে নিতে পারছে না। রানা উপলব্ধি করল, সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুকে ওরই হাতে তুলে দিয়ে গেছে লোকটা।

ও যে থাকবে না, এ সিদ্ধান্ত অনেক আগেই নিয়েছিল মানস ঘোষ।

বিশ মিনিট পর ডক্টর নাদিরাকে নিয়ে আকাশে উঠল দুরন্ত ঈগল। কেবিনে পাশাপাশি দুটো সিটে বসেছে মাসুদ রানা ও লিউ ফুচুং। দুরন্ত ঈগলকে চালাচ্ছে ফুচুঙের সঙ্গে করে নিয়ে আসা পাইলট। বেইজিঙে যাচ্ছে ওরা। মাঝে-মধ্যে রানার হাত

চলে যাচ্ছে ভোলার পিঠে। আদর করছে ওর পায়ের কাছে শুয়ে থাকা মানসের প্রিয় ডোবারম্যান পিনশার ভোলাকে।

থাই এয়ারফোর্সের আটটা জেট ফাইটার এসকর্ট করে থাই এয়ারস্পেসের শেষসীমা পর্যন্ত পৌঁছে দিল ওদেরকে।

***